নাটক

রঙমহলে অভিনীত

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সর্ব্বজন পরিচিত কাহিনী হইতে

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

এক টাকা আট আনা

শরৎচন্দ্রের

সুযোগ্য বংশধর

শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু

নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে 'নিষ্কৃতি' মঞ্চস্থ হয়েছে। রঙ্মহলের প্রীতিভাজন নট্ শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীদেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় এর মূলে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন—তা অবিস্মরণীয়। বঙ্গীয় প্রগতি চলচ্চিত্র নাট্যসঙ্ঘ ১৯৫১ সালের শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-কৃতিত্ব বলে 'নিষ্কৃতি'কে অভিনন্দিত করেছেন। এ অভিনন্দনের মূলে স্বনামধন্য কীর্ত্তিমান নট্ শ্রীজহর গাঙ্গুলী, বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা এবং সর্ব্বজনস্নেহধন্যা শ্রীমতী রাণীবালার কৃতিত্ব সর্ব্বাধিক। এই নাটকের সঙ্গে, এঁদের যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। ইতি—

১৫ই জানুয়ারী ১৯৫২	বিনীত **দেবনারায়ণ গুপ্ত**

প্রথম রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দ

শুভ-উদ্বোধন ১৫ই আশ্বিন ১৩৫৮, ২রা অক্টোবর, মঙ্গলবার ইং ১৯৫১

গিরীশ	...	শ্রীজহর গাঙ্গুলী
হরিশ	...	শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায়
বেহারী	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ)
রমেশ	...	শ্রীঅবনী মজুমদার
হরলাল	...	শ্রীদেবেন ব্যানার্জ্জি
গণেশ	...	শ্রীউমা দাস
মণীন্দ্র	...	শ্রীপুলিন মিত্র
হরিচরণ	...	মাঃ রূপকুমার পরে মাঃ লিটন
অতুল	...	মাঃ সুখেন দাস
কানাই	...	মাঃ চপল কুমার
বিপিন	...	মাঃ সত্যব্রত
পটল	...	মাঃ সুব্রত
সিদ্ধেশ্বরী	...	শ্রীমতী প্রভা দেবী
নয়নতারা	...	সর্ব্বজনস্নেহধন্যা রাণীবালা পরে শ্রীমতী অঞ্জলী রায়
শৈলজা	...	শ্রীমতী ঝর্ণা দেবী
নীলা	...	শ্রীমতী শেফালী দত্ত পরে শ্রীমতী গীতা দেবী

সত্বাধিকারী	...	শ্রীসীতানাথ মুখোপাধ্যায়
কাহিনী	...	৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নাট্যরূপ	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
সুর-সৃষ্টি	...	শ্রীদুর্গা সেন
মঞ্চ-শিল্পী	...	শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
যন্ত্রীসঙ্ঘ	...	শ্রীসুবোধ মল্লিক (ছিনু), শ্রীশরদিন্দু ঘোষ, শ্রীকালীপদ সরকার, শ্রীবিশ্বনাথ কুণ্ডু, শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, শ্রীকানাই দাস, শ্রীবংশীধর রায়।
স্মারক	...	শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীসত্য সরকার
লিপিকার	...	শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত
সজ্জাকর	...	শ্রীনৃপেন রায়, শ্রীবিভূতি দাস, শ্রীপঞ্চানন সাঁতরা, মহবুব্
আলোকশিল্পী	...	শ্রীশ্যামসুন্দর কর, শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত, শ্রীশক্তিপদ ঘোষ, শ্রীনন্দলাল দাস
দৃশ্য সংযোজনায়	...	শ্রীমণীন্দ্র দাস, শ্রীকালীপদ সোম, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীবাদল ঘোষ, শ্রীগৌরী কুর্মী, শ্রীঅনাদি ঘোষ
আহার্য্য সংগ্রাহক	...	শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্চ ব্যবস্থাপক	...	শ্রীদেবেন ব্যানার্জ্জি
ঐ সহ	...	শ্রীনীরেন মিত্র
ব্যবস্থাপক	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয়

পুরুষ

গিরীশ	...	খ্যাতনামা উকিল ; কলিকাতা ভবানীপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
হরিশ	...	ঐ সহোদর, উকিল
রমেশ	...	ঐ খুড়তুতো ভাই
মণীন্দ্র, হরিচরণ, বিপিন	...	গিরীশের পুত্র
অতুল	...	হরিশের পুত্র
কানাই	...	রমেশের পুত্র (প্রথমা পত্নীর)
পটল	...	ঐ পুত্র
হরলাল	...	গিরীশের পুরাতন ভৃত্য
গণেশ চক্রবর্ত্তী	...	গিরীশের গৃহ-সরকার
বেহারী	...	গ্রাম্য-ভিখারী

স্ত্রী

সিদ্ধেশ্বরী	...	গিরীশের স্ত্রী
নয়নতারা	..	হরিশের স্ত্রী
শৈলজা	...	রমেশের স্ত্রী
নীলা	...	গিরীশের কন্যা

নিষ্কৃতি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরীর শয়ন কক্ষ

ঘরটি আসবাব পত্রে সুসজ্জিত। সম্পূর্ণ আভিজাত্যের ছাপ রক্ষা করিতেছে। দুইটী প্রাচীনতম পালঙ্ক পাশাপাশি পাতিয়া তাহার উপর বিস্তীর্ণ শয্যা পাতা হইয়াছে। এই শয্যার এক পার্শ্বে অসুস্থা সিদ্ধেশ্বরী কোন রকমে তাঁহার একটু জায়গা করিয়া শুইয়া আছেন। পালঙ্কের নীচে অর্থাৎ মেঝের উপর কানাই একটি টেবিল ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া সোৎসাহে চীৎকার করিয়া ভূগোল পড়িতেছে এবং বিপিন ততোধিক চিৎকার করিয়া ফার্ষ্ট বুক পড়িতেছে। খাটের উপর হরিচরণ মনোযোগের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" পড়িতেছিল। পার্শ্বে আর একখানি পাঠ্য পুস্তক বালিশের উপর খোলা অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। পটল লেপ মুড়ি দিয়া সিদ্ধেশ্বরীর এক পাশে শুইয়া আছে। তাহাকে দেখা যাইতেছে না। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কানাই ও বিপিন যেরূপ চীৎকার করিয়া পড়িতেছিল তাহাতে সিদ্ধেশ্বরী কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন।

একযোগে পড়িতেছে {

কানাই। যে বিস্তীর্ণ জলরাশি বঙ্গদেশের দক্ষিণে অবস্থিত তাহাকে বঙ্গোপসাগর বলা হয়—

বিপিন। The Ram—র‍্যাম মানে ভেঁড়া—

গিরীশ প্রবেশ করিলেন

গিরীশ। কি গো! এ বেলায় কেমন আছ?

সিদ্ধে। ভালই আছি।

গিরীশ। ভাল যা আছ, তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু ব্যাপার কি? তোমার ঘরে বসে কানাই বিপিন এরা সোৎসাহে চিৎকার করে পড়াশোনা করছে যে?

সিদ্ধে। বুঝতে পারছ না? ছোটবৌ যে বাড়ী নেই!

গিরীশ। বাড়ী নেই? সেকি! কোথায় গেলেন?

সিদ্ধে। পটলডাঙ্গায়। তার মাসির বাড়ী—

গিরীশ। কখন গিয়েছেন?

সিদ্ধে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর।

গিরীশ। দেখ দেখি, সেই দুপুরে গিয়েছেন, এখনো পর্য্যন্ত আসেন নি—মহা-ভাবনার কথা হোল দেখছি—

সিদ্ধে। বলে ঝকমারি করেছি। বলি, এতে ভাবনার কি আছে? তোমার যত বাজে ভাবনা! মাসীর বাড়ী কতদিন পরে সে গেছে—তোমার জন্যে কি দু-পাঁচ ঘণ্টা থাকতেও পারবে না।

গিরীশ। না না, থাকুন না তার জন্যে ত নয়—কিন্তু সন্ধ্যে উৎরে রাত্রি হয়ে গেল—সেই পটলডাঙ্গা থেকে ভবানীপুরে আসা—

সিদ্ধে। আসবে ত ঘরের গাড়ীতে। হেঁটে ত আর আসবে না। তাতে ভাবনার কি আছে?

গিরীশ। তা তাঁকে আনবার জন্যে গাড়ী গেছে ত?

সিদ্ধে। সে বলে গেছে, আসবার সময় তার মাসীর বাড়ীর গাড়ীতেই আসবে।

গিরীশ। তিনি ছেলেমানুষ বল্লেন বলে, তুমি অম্‌নি তাতে মত দিলে? না না, এ ত ঠিক হয়নি। আমাদের ঘরের বৌ। আমাদেরই নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা উচিত। তা ছাড়া ঘরে যখন গাড়ী রয়েছে— আমরা তাঁদের ওপর এ ভারটা চাপাতে যাই কেন?

সিদ্ধে। (বিরক্ত-ভাবে) তা অত যদি সহীস কোচ্‌ম্যানকে বলে দাও গাড়ী জুড়ে নিয়ে যাক্‌।

গিরীশ। সেই ভাল। তাই বলে দিই—

প্রস্থানোদ্যত

সিদ্ধে। এমন ব্যস্তবাগীশ মানুষও দেখিনি! ছেলেমানুষ দুটো দিন যে কোথাও গিয়ে থাকবে তারও উপায় নেই—

গিরীশ। (ফিরিয়া) তা কি বলছ? গাড়ী কি তাহলে পাঠাব? না—না?

সিদ্ধে। না পাঠাতে হবে না। তার যখন সুবিধে হবে সে আপনি আসবে। (ছেলেদের প্রতি) নে তোরা পড়্‌—

গিরীশ অনন্যোপায় হইয়া চলিয়া গেলেন। ছেলেরা সোৎসাহে যথারীতি পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পড়ার পর, বিপিন সিদ্ধেশ্বরীর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া বলিল।

বিপিন। আজ আমার ডানদিকে শোবার পালা না বড়মা?

কানাই। না বিপিন, তুমি না, বড়মার ডান দিকে শোব আজ আমি।

বিপিন। বা রে! তুমি ত কাল শুয়েছিলে সেজদা?

কানাই। কাল শুয়েছিলুম? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে আমি বাঁ দিকে—

পটল। (লেপের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল) এ্যাঁ! বাঁ দিকে বৈ কি! আমি ব'লে বড়মার বাঁ দিকে শুয়ে রয়েছি এতক্ষণ—

কানাই। বড়ভায়ের সঙ্গে তর্ক ক'রো না বলে দিচ্ছি, মাকে ব'লে দেব।

পটল। (সিদ্ধেশ্বরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল) তুমি সেজদাকে বল না বড় মা, আমি কতক্ষণ ধরে শুয়ে আছি যে—

কানাই। (শাসনের স্বরে) ফের্ পটল!

ছেলেদের তর্কাতর্কির মাঝে শৈলজা কখন যে দরজার কাছে দুধের বাটী হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই, শৈলজা বিরক্তভাবে কহিলেন।

শৈলজা। ওরে বাবারে বাবা—একে দিদির অসুখ! তার ওপর সব ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে দেখ না! ঘরে যেন ডাকাত পড়েছে!

শৈলজাকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘরের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা গেল—হরিচরণ 'আনন্দমঠ' বালিশের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক পড়িতে লাগিল, কানাই চীৎকার করিয়া 'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি' ইত্যাদি ভূগোলের শব্দগুলি আওড়াইতে লাগিল। পটল ও বিপিন ভয়ে জড়সড় হইয়া লেপের মধ্যে মুখ লুকাইল। শৈলজা কহিলেন।

শৈলজা। ওরে ও "বিস্তীর্ণ জলরাশি" এতক্ষণ হ'চ্ছিল কি?

কানাই। (সভয়ে) পড়ছিলাম—

শৈলজা। পড়ছিলে? পড়ছিলে না ঝগড়া করছিলে?

কানাই। (সভয়ে) আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

শৈলজা। কোথায় গেল তারা? কাউকে দেখছি না যে—এরা সব পালাল কোথা দিয়ে?

কানাই। কেউ পালায় নি মা, ওরা সব ঐ লেপের ভেতর ঢুকেছে—

শৈলজা। (হাসিয়া) দিদি তোমাকে খেয়ে ফেল্লে যে! নির্ব্বিবাদে চুপ-চাপ মড়ার মত কী ক'রে যে প'ড়ে থাক, তা তুমিই জান। হাত না

হয় তোমার নাই উঠে, তাই বলে কী একবার ধম্‌কাতেও পার না? (বিপিন ও পটলের গা হইতে লেপ খুলিয়া লইয়া) ওরে—এইসব ছেলেরা বেরো—চল্‌ আমার সঙ্গে—

সিদ্ধেশ্বরী। ওরা যা কচ্ছে তা কচ্ছে, তা তুইই বা বিরক্ত হচ্ছিস্‌ কেন?

শৈলজা। বিরক্ত হ'বো না, একে রোগের জ্বালা, তার ওপর এই ছেলে-দের চীৎকার—একি ভাল লাগে?

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁ আমার ভাল লাগে, তোকে বকৃতেও হবে না আর মারধোরও করতে হবে না—যা তুই এখান থেকে। লেপের ভেতর ছেলেরা সব হাঁপিয়ে উঠেছে!

শৈলজা। (হাসিয়া)—আমি কী ওদের শুধু মারধোরই করি দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী। করিস্‌ বৈ কি শৈল, বড্ড করিস্‌; তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালীবর্ণ হয়ে যায়। আচ্ছা যা না বাপু ওদের স্মুখ থেকে, ওরা বেরুক।

শৈলজা। আমি ওদের নিয়ে তবে যাব। অমন করে দিবারাত্রি জ্বালাতন কর্‌লে তোমার অসুখ সার্‌বে না।

সিদ্ধেশ্বরী। ছেলেপুলে কাছে থাক্‌লে অসুখ যদি না সারে, ত না সারুক; আমি অমন খালি বিছানায় শুতে পারি না।

শৈলজা। বেশ ত! খালি বিছানায় শুতে যদি তোমার কষ্ট হয়, পটল সবচেয়ে শান্ত, সেই শুধু তোমার কাছে শোবে, আর সকলকে আজ থেকে আমার কাছে শুতে হবে। এখন তুমি ওঠো দেখি, এই দুধটুকু খেয়ে নাও। (সহসা হরির প্রতি) হ্যাঁরে হরি? সাড়ে ছটার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত?

হরিচরণ। (আম্‌তা আম্‌তা করিয়া) ওষুধ কই! তা ত—

শৈলজা। বুঝতে পেরেছি; মনে ছিল না?

সিদ্ধেশ্বরী। ওষুধ টোষুধ—আর আমি খেতে পারব না শৈল।

শৈলজা। (গম্ভীর হইয়া) তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চুপ কর। আমি হরির কাছে জবাব চেয়েছি, কেন সে ওষুধ দেয় নি—

হরি। (ভীতকণ্ঠে) মা খেতে চান না যে—

শৈলজা। তিনি খেতে চান বা না চান, তুই দিতে গিয়েছিলি কিনা তাই বল্?

সিদ্ধেশ্বরী। (বিছানায় উঠিয়া বসিয়া) কেন তুই আবার এখন হাঙ্গামা করতে এলি বলত শৈল? ওরে ও হরিচরণ! কী ওষুধ টোষুধ আমাকে দিবি দেনা বাবা শীগ গির ক'রে।

হরিচরণ খাট হইতে ব্যস্তভাবে নামিয়া ঔষধের গেলাস ও শিশি লইয়া ছিপি খুলিতে গেল—শৈলজা বাধা দিয়া কহিল।

শৈলজা। শুধু গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হোল? জল চাইনে? মুখে দেবার কিছু চাইনে? তোদের এক'শবার বারণ ক'রেছি না যে, ব্যাগার ঠেলা কাজ তোরা করবি নে।

হরি। কোথাও কিছু নেই যে খুড়িমা, মুখে দেবার কী দেবো?

শৈলজা। না আন্‌লে, কিছু কী উড়ে আস্‌বে?

সিদ্ধেশ্বরী। ও কোথায় কী পাবে যে দেবে? এ সব কি পুরুষ মানুষের কাজ? তোর যত শাসন ওই ছেলেদের ওপর। কেন নীলাকে ওষুধটা দেওয়ার কথা বলে যেতে পারিস্ নি? সে মুখপোড়া মেয়ে, একবারও এ ঘর মাড়ায় না। চেয়ে দেখে না যে, মা মরেছে কি বেঁচে আছে।

শৈলজা। তার ওপর তুমি শুধু শুধু রাগ করছ দিদি, সে কি বাড়ীতে ছিল? সে আমার সঙ্গে পটলডাঙ্গায় আমার মাসিমার বাড়ীতে গিয়েছিল যে!

সিদ্ধেশ্বরী। তুই গেলি তোর মাসীর বাড়ী, তা ওকে নিয়ে গেলি আবার কোন্ হিসেবে?

শৈলজা। (হাসিয়া) ও আমার মাসীমার সতীন কিনা, তাই—

সিদ্ধেশ্বরী। তোর হয়েচে একচোখো ভালবাসা!

শৈলজা। ও কথা বলোনা দিদি, মেয়ে আজ বাদে কাল শ্বশুর বাড়ী যাবে, তখন কি আর পাঁচ জায়গায় যাওয়া-আসা করতে পারবে?

সিদ্ধেশ্বরী। দে হরিচরণ, ওষুধ ঢলে দে, আমি অমনি খাব।

হরিচরণ ওষুধ ঢালিতে উদ্যত হইল, শৈলজা বাধা দিয়া বলিলেন।

শৈলজা। তুই থাম্ হরি, আমি দিচ্ছি।

প্রস্থান

সিদ্ধেশ্বরী। যা হরি, তুই পড়্‌গে যা—

হরিচরণ। খুড়িমা আগে আসুন, তোমার ওষুধ খাওয়া হোক্, তারপরে যাচ্চি।

নীলার প্রবেশ

নীলা। এ বেলা কেমন আছ মা?

সিদ্ধেশ্বরী। ভালই আছি। তোর সতীনকে দেখে এলি?

নীলা। হ্যাঁ। খুড়িমার মাসীমা এত আদর যত্ন করেন, যে তোমায় কী ব'লব মা!

শৈলজার প্রবেশ—তাহার এক হাতে রেকাবীতে কিছু কাটা ফল, অপর হাতে জলের গেলাস।

শৈলজা। সতীনের প্রশংসায় ত পঞ্চমুখ! এদিকে যে দিদির ওষুধ খাওয়া হয়নি, সে খেয়াল আছে?

শৈলজা শিশি খুলিয়া ওষুধ ঢালিয়া সিদ্ধেশ্বরীর হাতে দিলেন।

শৈলজা। নাও, এ টুকু খেয়ে নাও।

সিদ্ধেশ্বরী ওষুধটুকু খাইলেন ও জল খাইয়া একটুক্‌রা ফল মুখে দিলেন ইতিমধ্যে নয়নতারা তার পুত্র অতুলকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। অতুল বার চৌদ্দ বছরের বালক। সাহেবী পোষাকে সজ্জিত। গায়ে একটি নতুন কোট। নয়নতারা অতুলকে সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে ধরিয়া গায়ের কোটটি দেখাইয়া বলিলেন।

নয়ন। দিদি, দর্জ্জি অতুলের এই কোট্‌টা তৈরী ক'রে এনেছে—কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে—

সিদ্ধেশ্বরী। এই জামার দাম কুড়ি টাকা!

নয়ন। এ আর বেশী কী দিদি? আমরা যখন বিদেশে থাকৃতাম, তখন আমার অতুলের এক একটা স্যুট্ করতে যাট-সত্তর টাকারও বেশী—লেগে যেত।

সিদ্ধেশ্বরী। (আশ্চর্য্য হইয়া) স্যুট্!

নয়ন। হ্যাঁ, স্যুট্। বুঝতে পারলে না, এই কোট, প্যাণ্ট, নেক্‌টাই, একে আমরা স্যুট্ বলি।

সিদ্ধেশ্বরী। ও! শৈল কুড়িটা টাকা মেজ বৌকে এনে দে তো?

শৈলজা। দিচ্ছি!

শৈলজা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নয়ন। তুমি না পার চাবিটা আমাকেই দাও না, আমিই না হয় বার করে নিচ্ছি।

নীলা। চাবি মা কোথায় পাবেন? লোহার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়িমার কাছেই থাকে। তাই তো খুড়িমা চলে গেলেন, টাকা বের করে আনতে।

নীলার প্রস্থান

নয়ন। ওঃ!

অতুল সিদ্ধেশ্বরীর সম্মুখে আগাইয়া গিয়া—

অতুল। দেখত জেঠিমা কোট্‌টা কেমন হয়েছে?

সিদ্ধেশ্বরী। খুব ভাল হয়েছে।

অতুল। কোট কাটা ভয়ানক শক্ত। সব দর্জ্জি ভাল ভাবে কোট কাট্‌তে পারেনা। এর সব চেয়ে মুস্‌কিল্‌ হচ্ছে—হাতের সঙ্গে কাঁধটা মিলিয়ে জোড়া।

ইতিমধ্যে শৈলজা ঘরে প্রবেশ করিলেন ও অতুলের হাতে দুখানি দশ টাকার নোট দিয়া কহিলেন।

শৈলজা। এই নাও অতুল।

অতুল টাকাটি হাতে লইল।

নয়ন। ছেলেটির তোরঙ্গ-ভরা পোষাক, তবু জামা তৈরীতে আশ মেটে না।

অতুল। কত-বার বলব মা তোমায়, আজকালকার ফ্যাশানই এই রকম, কাট্‌-ছাঁট্‌ অন্ততঃ ভাল না হলে লোকে হাসবে যে—

অতুল চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া হরিচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিল।

অতুল। আমাদের এই হরিদা যা গায়ে দিয়ে বাইরে যায়, দেখেতো আমার লজ্জাই করে। এখানে ঝুলে আছে, এখানে কুঁচ্‌কে আছে, ছিঃ ছিঃ! কি বিচ্ছিরিই না দেখায়! হরিদা ঐ সব জামা গায় দিয়ে যখন বেড়ায়—দেখে মনে হয়, যেন একটা পাশবালিশ হেঁটে যাচ্ছে—

অতুল কথা শেষ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে নয়নতারাও হাসিয়া উঠিলেন। হরিচরণ শৈলজার মুখের দিকে করুণ নেত্রে চাহিল। সিদ্ধেশ্বরী মনে ব্যথা পাইলেন।

সিদ্ধেশ্বরী। সত্যিই তো ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই শৈল! দে না বাছাদের দুটো একটা নতুন জামা তৈরী করিয়ে?

অতুল। আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দর্জ্জিকে দিয়ে দস্তুর-মত তৈরী করে দেব, হুঃ হুঃ বাবা! আমাকে ফাঁকি দেবার যো নেই।

শৈলজা। তোমাকে আর জ্যাঠামো করতে হবেনা অতুল, তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে, ওদের জামা তৈরী করাবার লোক আছে। (অন্যান্য ছেলেদের প্রতি) চ—চ—খাবি চ।

ছেলেদের প্রস্থান।

শৈলও বিরক্তভাবে প্রস্থানোদ্যোত।

নয়ন। দিদি! ছোট বৌএর কথা শুন্‌লে? কেন? অতুল আমার কী অন্যায় কথা বলেছে?

শৈলজা যাইতে যাইতে ফিরিয়া কহিলেন।

শৈলজা। ছোট বৌয়ের কথা দিদি অনেক শুনেছেন, তুমিই শোননি। অতুল ছোট ভাই হয়ে, হরিকে যেমন করে ভেঙ্গালে তাতে তোমার কোথায় বকা উচিত ছিল, তা নয়, তুমি হাসলে! ও যদি আমার পেটের ছেলে হতো, তাহলে আজ আমি ওকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম।

প্রস্থান

অতুল। শুন্‌লে মা! শুন্‌লে? এ্যাঁ—জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম!

অতুলের প্রস্থান

নয়ন। আজ আমার অতুলের জন্মবার আর ছোট বৌ যা মুখে এলো তাই বলে গালাগাল দিয়ে চলে গেল! এ রকম নিত্যি খিটিমিটির

মধ্যে আমরা তো থাকতে পারব না দিদি। তুমি নিজে কিছু না করে দিলে, আমাদেরই যা হোক্ একটা উপায় করে নিতে হবে। আমি কারো খাইও না পরিও না, যে মুখ বুঁজে ঝাঁটা খাব।

সিদ্ধে। সেকি! ঝাঁটা মারবে কেন মেজ বৌ! ওর ঐ রকমই কথা—। তাছাড়া তোমাকে তো বলেনি—

নয়ন। আর কী করে বলে? অতুলকে জ্যান্ত পুঁত্‌তে চেয়েছিল। আমি নাকি খিলখিল্ করে হেসেছি! শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকনি দিদি। আবার ঝাঁটা মারে কী করে? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন উঠেনি?

সিদ্ধে। ওকি কথা মেজবৌ? আমি কী তাকে শিখিয়ে দিয়েছি?

নয়ন। শিখিয়ে দিয়েছ কি না দিয়েছ তা তুমিই জান। কেউ কারো মন জানতে যায়না দিদি, চোখে দেখে কানে শুনেই বলতে হয়। এত কাল বিদেশে কাটিয়ে দুটি ভাই এক জায়গায় থাকতে পাবেন বলে, উনি চলে এলেন। দুভায়ের এক জায়গায় থাকা তোমার যদি পছন্দ না হয়, তোমার সংসারে এসে আমরা যদি আপদ বালাই হয়ে থাকি; বেশ তো, সে কথা তুমি নিজে বল্‌লেই ত পার। আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

সিদ্ধে। সেকি! আমি লেলিয়ে দিয়েছি?

নয়ন। আমরাও ঘাস খাইনে, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে—দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলে তো দেখতে শুনতে ভাল হয়। আর, আমরাও সমানে চলে যাই। উঃ! উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন! যাকে তাকে বলে বেড়ান—আমাদের বৌঠাকরুণ মানুষ নন, সাক্ষাৎ—ঠাকুর দেবতা।

সিদ্ধে। (কাঁদিয়া) এমন অপবাদ আমার শত্রুও দিতে পারে না

মেজবৌ। এসব কথা ঠাকুরপোকে শুনানোর চাইতে আমার মরা ভাল। তোমরা বিদেশ থেকে কতকাল পরে ফিরে এসেছ বলে, আমার যে কী আনন্দ হয়েছে—তা তোমাকে কী বলব। যদি তুমি বিশ্বাস না কর, আমার ছেলেদের কাউকে না হয় আন, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে শৈল ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল।

শৈল। একি! এখনও দুধটুকু খাওনি দিদি।

সিদ্ধে। (কাঁদিয়া) তুই বের্ হয়ে যা—আমার সুমুখ থেকে। দূর হয়ে যা। তোর যা মুখে আসবে, তুই তাই লোককে বলবি?

শৈল। বাঃ রে! কাকে আবার কী বলেছি?

সিদ্ধে। কাকে কী না বলছিস্ তাই শুনি? আমাকে বলে বলে তোর বুকের পাটা বড্ড বেড়ে গেছে? না? কে তোর কথার ধার ধারে রে? সবাইকে কী তুই দিদি পেয়েছিস্? দূর হ—আমার সুমুখ থেকে—

শৈল। আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, দুধটা আগে খেয়ে নাও, এই বাটিটায়—আমার দরকার আছে।

সিদ্ধে। খাব না, কিচ্ছু খাব না, তুই যা—আজ হয় তুই বাড়ী থেকে দূর হ—না হয় আমি বাড়ী থেকে দূর হই, দুটোর একটা না করে আমি জল-স্পর্শ করব না।

শৈল। আমি তো এই সেদিন বাপের বাড়ী থেকে এসেছি দিদি, এখন আর যেতে পারবো না। তার চেয়ে বরং তুমি তোমার বাপের বাড়ী কাটোয়ায় গিয়ে দিনকতক থাক। কাছেই গঙ্গা—অমনি বার করে নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কী তুচ্ছ কথা নিয়ে

তোলপাড় কচ্ছ বলো তো? রোগে ভুগে ভুগে দিদি আধমরা হয়েছেন, আমি যদি কোন দোষ করে থাকি, সে কথা দিদিকে না বলে আমাকে বললেই তো হয়।

সিদ্ধে। তুই লোককে যা তা বলবি, আর লোকে বলবে না? আজ অতুলের জন্মদিন, কেন বাছাকে তুই অমন কথা বল্‌লি?

শৈল। বাঃ রে! কি আবার এমন বলেছি।

সিদ্ধে। বলিস্‌নি? জ্যান্ত পুঁতে ফেলতাম কেন বল্লি?

শৈল। (হাসিয়া) ও! এই কথা, কিচ্ছু ভয় কর না মেজদি, তোমার মত আমিও তো মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেম্‌নি। মায়ের গালাগালি লাগে না মেজদি। আচ্ছা, আমি অতুলকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করছি; তা হলে হবে তো? নাও দিদি, তুমি দুধটুকু খেয়ে নাও—আমি আবার উনুনে কড়া চড়িয়ে এসেছি।

সিদ্ধে। আচ্ছা তুই আগে তোর মেজদির কাছে মাপ্‌ চা—ঘাট্‌ মান, তারপরে খাচ্ছি।

শৈল। আচ্ছা মানছি।

শৈল হেঁট হইয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া বলিল।

শৈল। আমি যদি কোন অন্যায় করে থাকি মেজদি, মাপ করো, আমি ঘাট্‌ মানছি।

নয়নতারা গম্ভীরভাবে শৈলর হাত দুইটি ধরিয়া তুলিল। কোন কথা কহিল না। শৈলজা ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর নিকট আগাইয়া আসিয়া কহিল।

শৈল। সব গণ্ডগোল তো মিটে গেল; এবার দুধটুকু খাও দিদি।

শৈলজার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন।

সিদ্ধে। এ পাগ্‌লীর কথায় কোন দিন রাগ করো না মেজবৌ! এই

আমাকেই দেখনা, ওকে বকি ঝকি, কত গালাগাল মন্দ করি, কিন্তু একদণ্ড ওকে দেখতে না পেলে, বুকের ভেতর যেন কী রকম করে! (শৈলর প্রতি) কিন্তু এত দুধ তো খেতে পারবো না দিদি।

শৈল। খুব পারবে। খাও।

সিদ্ধেশ্বরী দুধটুকু শেষ করিলেন ও পরে কহিলেন।

সিদ্ধে। তোর কথা রাখলাম কিন্তু এখুনি অতুলকে ডেকে আশীর্ব্বাদ করিস্ শৈল।

শৈল। এক্ষুণি করছি।

এই বলিয়া দুধের বাটি লইয়া শৈলর হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছেলেদের পড়িবার ঘর

ঘরের মধ্যস্থলে একটী টেবিল পাতা, টেবিলের চারদিকে চারখানি চেয়ার, টেবিলের উপর দোয়াত কলম বই খাতা ইত্যাদি ছড়ান। ঘরে কয়েকটি মাত্র ছবি ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি। একটি র‍্যাকে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক। অতুল ও হরিচরণ চেয়ারে বসিয়াছিল। উভয়কে দেখিয়া মনে হয়, বিশেষ চিন্তিত। অতুলের পরণে ফুল-প্যান্ট হাফ-সার্ট। হরিচরণের পরণে আধময়লা কাপড় জামা।

হরিচরণ। হাজার হোক ছোট খুড়িমা আমাদের গুরুজন, উনি যদি বকেই থাকেন, তাতে কী আর আমাদের রাগ করতে আছে?

অতুল। ওঃ! ভারি তো খুড়ি! ও কি আমাদের আপনার খুড়ি নাকি?

হরি। উনি আমাদের আপনার খুড়িই তো।

অতুল। তুমি কিছু জান না হরিদা। ছোট কাকা হচ্ছে—বাবা জেঠা-মশায়ের খুড়তুতো ভাই। দয়া করে ওঁরা ওকে এ বাড়ীতে থাকতে দিয়েছেন তাই।

হরি। ছিঃ! ও সব কথা বলতে নেই অতুল।

অতুল। না। বলবে না বৈকি? আমি কারো ধার ধারি না বাবা। এ শর্ম্মা অতুলচন্দ্র রেগে গেলে ছোট খুড়ি টুড়ি কাউকে কেয়ার করে না।

হরিচরণ চারিদিকে সন্তর্পণে চাহিয়া বলিল।

হরি। অবশ্য রেগে গেলে আমিও করি না।

ইতিমধ্যে বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য হরলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে, অতুলের নতুন কোটটি দেখা গেল। সে কোটটি মুড়িয়া লইয়া আসিয়াছিল। অতুলকে দিয়া কহিল।

হরলাল। এই নাও, জামাটা গায়ে দাও। রাগ করে জামা গায়ে না দিয়েই চলে এসেছে? মেজবৌমা আবার আমায় দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। নাও পরে ফেল।

হরলালের নিকট হইতে জামাটা লইয়া অতুল ক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

অতুল। যা! আমি পরতে চাই না। কোটটা আনার ছিরি দেখ না! পাড়াগাঁয়ের ভূত কোথাকার! কী করে জামা আনতে হয় জান না?

হর। কী করে জানব বল, ও সব জামা কী কখনো গায়ে দিয়েছি? চিরদিন গায়ে গামছা দিয়েই কেটে গেল, ছোটমার কল্যাণে তবু এখন যা হোক একটা ফতুয়া উঠেছে।

অতুল। (ভেঙাইয়া) এটা তোমার ফতুয়া নয়—কোট। ওর ইস্তিরি নষ্ট হয়ে গেলেই সব গেল।

হর। তাই নাকি? তা এবেলা না হয় কোন রকমে গায়ে দাও। ওবেলায় আমি আবার ইস্তিরি করে এনে দেব।

অতুল। তোমাকে ইস্তিরিও করে এনে দিতে হবে না—আর আমি পরতেও চাই না।

হর। উঃ! তুমি যে বড় কড়া সাহেব দেখছি গো! তবু যদি গায়ের রংটা কটা হতো।

অতুল। (ধম্‌কাইয়া) চুপ্ কর্ বুড়ো জানোয়ার কোথাকার! চাকর, চাকরের মত থাকবি।

হরি। ছি, ছি! অতুল, হরলালদাকে কি ওসব কথা বলতে আছে? মা শুনলে রাগ করবেন যে।

অতুল। রাগ করলেন তো বড় বইয়েই গেল। তোমাদের সবই বিচ্ছিরী। বাড়ীর চাকরকে দাদা! বাজার সরকার ঐ গণেশ চক্রবর্ত্তীকে জেঠামশাই এসব বলা আমার ধাতে সইবে না।

হর। তা জানি ছোট সাহেব, তোমার ধাতটা একটু চড়া এবং কড়া। তাই জামাতেও তোমার কড়া ইস্তিরীর দরকার হয়। কিন্তু দেখ ছোট সাহেব, সবদিকে মান্‌জাটা অত কড়া না দিয়ে, একটু নরম করার চেষ্টা করো। নইলে কারুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না। অতো কড়া মান্‌জার সুতোয় ঘুড়ি পড়লে যে সব কেঁচ্ কেঁচ্ করে কেটে যাবে—

প্রস্থান

অতুল। তোমরা চাকর বাকর রাখতে জান না হরিদা। তোমাদের আস্কারাতেই তো ওদের এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে। চাকর বাকরদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতালে কি মান থাকে?

হরি। কিন্তু বাড়ীর লোকজনদের হেনস্থা করা যে বাবা মা মোটেই পছন্দ করেন না।

অতুল। না করলেন তো বয়েই গেলো—আমার সঙ্গে বেশী চালাকী করতে এলে এবার দেব দু'ঘা বসিয়ে।

ইতিমধ্যে কানাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল।

কানাই। মেজদা, সেজদা ছোট খুড়িমা ডাকছেন, চটপট চলে এসো—

হরি। ছোট খুড়িমা আমাকে ডাকছেন? কখনো না। আমি তো কিছু করিনি! যাও অতুল, ছোট খুড়িমা বোধহয় তোমাকেই ডাক্‌ছেন।

কানাই। না, না, তোমাকে আর সেজদাকে—দুজনকেই ডাকছেন। এক্ষুণি চলে এসো।

কানাই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় অতুলের কোটটা মাটিতে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল।

কানাই। এঁ্যা! সেজদা তোমার নতুন কোটটা মাটিতে ফেলে দিলে কে?

কানাই কোটটি চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হরি। চলো অতুল, ছোট খুড়িমা যখন ডেকেছেন তখন আর দেরী করে লাভ নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা করিগে যাই—চল। আমার আর ভয়, কী, আমি তো কিছু বলিনি, তুমিই বলেছো ছোট খুড়িমাকে কেয়ার কর না।

অতুল। আমি একা বলিনি, তুমিও বলেছো। কিন্তু কথাটা তো বলেছি—আমরা দুজনে একটু আগে, এই ঘরে, তুমি আর আমি ছাড়া তখন তো আর কেউ ছিল না। এর মধ্যে কথাটা তার কানে গিয়ে পৌছলো কী করে? ঐ ছোট খুড়ির চর হরলাল ব্যাটা পেছন থেকে কিছু শোনেনি ত?

হরি। ছোট খুড়িমাকে কিছু শুনতেও হয় না, দেখতেও হয় না। উনি আপনিই বুঝতে পারেন।

অতুল। ওঃ! একেবারে ভগবান! বলেছি—বেশ করেছি।

অতুল সগর্বে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হরিচরণ সকরুণ নেত্রে তাহার অনুসরণ করিল।

তৃতীয় দৃশ্য

বাড়ীর অন্দরমহল

পাশাপাশি দুখানি ঘর। একটি ভাঁড়ার ঘর, অপরটি রান্নাঘর। ঘরের সংলগ্ন বারান্দা সম্মুখে প্রশস্ত উঠান। উঠানের একপাশে কল ও চৌবাচ্চা। রান্নাঘরের খোলা জানালা দিয়া শৈলজাকে রান্নার কাজে ব্যস্ত দেখা গেল। নীলা রান্নাঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বসিয়া গান করিতেছে। তখন বেলা ৯টা—১০টা।

নীলার গান

প্রভু তোমার চরণ ধূলি
পড়বে যবে—
সেদিন তিমির-ভরা এই আঙ্গিনা
তীর্থ হবে।
তোমার আসার আশায় আঁখি
রইবে চেয়ে—
ধন্য হবে পরাণ আমার
তোমায় পেয়ে॥
মোর নয়নে তোমার জ্যোতি
উঠ্‌বে ফুটে কবে।
(সেদিন) নয়ন জলে ধুইয়ে চরণ
করব তোমায় করব বরণ
ধুইয়ে চরণ,
আঁখিতে মোর মিলিয়ে আঁখি
তুমি পরাণ জুড়ে রবে॥

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সগর্ব্বে অতুলকে প্রবেশ করিতে দেখা গেল। সঙ্গে হরিচরণ। নীলাকে দেখিয়া অতুল জিজ্ঞাসা করিল।

অতুল। ছোট খুড়ি কোথায় রে নীলাদি?

নীলা। (রান্নাঘরের দিকে হাত বাড়াইয়া) ঐ যে রান্না ঘরে।

রান্নাঘরের মধ্য হইতে শৈলজা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শৈল। কে রে নীলা?

নীলা। মেজদা আর অতুল!

ইতিমধ্যে অতুল জুতা পায়ে দিয়া রান্নাঘরের দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। শৈলজা রান্নাঘরের দরজার নিকট আসিয়া কহিলেন।

শৈল। অতুল এসেছিস্? দাঁড়া বাবা।

হঠাৎ পায়ের দিকে নজর পড়িতেই শৈলজা কহিলেন।

শৈল। ও কি রে? জুতো পায় দিয়ে কি এদিকে আসে?

অতুল। কেন? জুতো পায় দিয়ে এলে কী হয়?

শৈল। এযে হেঁসেল। হেঁসেলে কী জুতো পায় দিয়ে ঢুকৃতে আছে?

অতুল। আমি তো ঘরের ভেতরে যাইনি, বাইরে আছি।

শৈল। বাইরে থাকলেও, এদিকে কেউ জুতো পরে আসে না।

অতুল। কিন্তু এখানে জুতো পরে এলে কী দোষ হয়, আমি জানৃতে চাই—

শৈল। তর্ক করো না অতুল, দোষ আছে, তুমি ওদিকে যাও। যাও—

অতুল। বারে! আমরা তো চুঁচড়োর বাড়ীতে জুতো পরে রান্না ঘরে যেতুম। আর এখানে ঘরের বাইরে দাঁড়ালেও দোষ!

শৈল। হ্যাঁ! যেখানকার যা নিয়ম। যা বলছি শোন।

অতুল। আমি ওসব নিয়ম মানি না।

ইতিমধ্যে হরিচরণের বড ভাই মণীন্দ্র ডাম্বল ভাঁজিয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে সেখান দিয়া

চলিয়া যাইতেছিল। অতুলের তর্কে সে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং শৈলজাকে জিজ্ঞাসা করিল, নীলা তাহার হইয়া উত্তর দিল।

মণীন্দ্র। কী হয়েছে খুড়িমা?

নীলা। অতুল জুতো পায় দিয়ে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছিল, ছোট খুড়িমা বারণ করছেন বলে, তর্ক করছে—

মণীন্দ্র। এই অতুল এদিকে আয়—

অতুল। না যাব না। এখানে জুতো পরে এলে কী হয় কী?

মণীন্দ্র। যাই হোক্ না কেন, তোকে যখন বারণ করছেন, তুই চলে আয় না?

অতুল। না আমি যাব না—

মণীন্দ্র। (বিরক্তভাবে) যাবি নে?

অতুল। না। ছোট খুড়ি আমায় দেখতে পারে না বলেই শুধু শুধু এই রকম করছে।

মণীন্দ্র ছুটিয়া গিয়া অতুলকে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিল এবং কান ধরিয়া কহিল।

মণীন্দ্র। হতভাগা বাঁদর! ছোট খুড়ি নয়—ছোট খুড়িমা। করছে নয়—করছেন বলতে হয় ইতর কোথাকার!

মণীন্দ্র অতুলের কান ছাড়িয়া দিবামাত্র অতুল কয়েকটি
কিল্ ঘুঁসি মণীন্দ্রকে বসাইয়া কহিল।

অতুল। তুমি ইতর! আমার গায়ে হাত দেবার তুমি কে হে? ছোট লোক শুয়ার! গাধা!

মণীন্দ্র পুনরায় রুখিয়া অতুলকে মারিতে যাইতেছিল,
অতুল চীৎকার করিয়া কহিল।

অতুল। ও গো! কে কোথায় আছ—শিগগীর এসো গুণ্ডাটা আমাকে মেরে ফেল্‌লে।

চেঁচামেচি ও গোলমাল শুনিয়া এক দিক হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও অপর দিক হইতে নয়নতারা ছুটিয়া আসিলেন। নয়নতারা অতুলকে জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন।

নয়ন। ওরে! আমি কেন মরতে এখানে এসেছিলাম রে! আমার অতুলকে একেবারে মেরে ফেলেছে!

অতুল। তুমি আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও মা, আমি ওই উল্লুককে জুতো পেটা করবো।

মণীন্দ্র। কী? জুতো পেটা করবি, যত বড মুখ নয় তত বড কথা, তবে রে—

মণীন্দ্র রুখিয়া মারিতে যাইতেছিল। শৈলজা বাধা দিয়া কহিল।

শৈল। মণি কী হচ্ছে কী? বাইরে যাও—যাও—যা হরি তুইও যা—

মণীন্দ্র ও হরি চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে গিরীশ ও হরিশ ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গিরীশ। কী গো! ব্যাপার কী? এত গোলমাল কিসের?

সিদ্ধে। কী জানি? মণি বুঝি অতুলকে কে মেরেছে তাই—

নয়ন। (ভাশুরের সম্মুখে লজ্জাহীনার ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন) মেরেছে নয়, একেবারে মেরে ফেলেছে।

গিরীশ। না, না, না, এ ত ভাল কথা নয়, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া—তা ছাড়া তোর চেয়ে ও বয়সে কত ছোট—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

গিরীশ ভাতৃ-বধূদের সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে শৈলজাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া বলিল।

অতুল। ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে, আর বড়দা এসে শুধু শুধু আমাকে মারলে!

হরিশ। (চীৎকার করিয়া) ছোট বৌমা! মণীকে তুমি কেন খুন করতে শিখিয়ে দিলে শুনি? কী ওর অপরাধ জানতে পারি কী?

নীলা। অতুল কথা শুনেনি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েছে—তাই।

নয়ন। তবে আমিও বলি ছোট-বৌ—তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেল্‌ছিল, তাই ও প্রাণের দায়ে গাল দিয়েছে, নইলে গাল দেবার ছেলে আমার অতুল নয়—

হরিশ। নয়ই তো! তোর ছোট খুড়িমাকে জিজ্ঞাসা কর নীলা, কথা যখন ও না শুনেছিলো, তখন আমাদের কাছে নালিশ না করে উনি অতুলকে মারতে হুকুম দিলেন কেন? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি কে যে অতুলকে শাসন করতে যান?

শৈলজা আরো খানিকটা ঘোম্‌টা টানিয়া লজ্জায় মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরিশ। আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি বৌমা! ভবিষ্যতে এ রকম শাসন তুমি আমার ছেলেকে করতে যাবে না।

সিদ্ধে। বেশ তো মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে, নিজে কেন শাসন কর্‌ছ? আমি বড়—আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, ঝি বৌকে শাসন করতে হয়—আমিই করবো। তুমি পুরুষ মানুষ—ভাশুর! একি কথা! লোকে শুন্‌লে বলবে কী? যাও—যাও, বাইরে যাও।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নয়নতারার শয়ন কক্ষ

ঘরের মধ্যস্থলে একটি খাট পাতা, একটি আলমারী। আলমারীর জিনিষ-পত্তর মেজেয় নামানো, ঘরের মধ্যে গোটা দুই বেডিং বাঁধা, সাংসারিক অন্যান্য আসবাবপত্র ইতঃস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। মোটকথা এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার সময় ঘর-দোরের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, এখানেও তাহারই অনুরূপ হইয়াছে। নয়নতারাকে এইসব বাঁধার ছাঁদা কাজে হরলাল সাহায্য করিতেছিল। নয়নতারা হরলালকে বলিলেন।

নয়ন। ওগুলো বেশ শক্ত করে বেঁধেছিস্ তো হরলাল?

হর। আজ্ঞে হ্যাঁ মেজ-মা, খুব শক্ত করে বেঁধে দিয়েছি, বাঁধন শক্ত করে না দিলে কী চলে? বাঁধনই হচ্ছে আসল জিনিষ, বাঁধন শক্ত না হলে, সব হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে যাবে যে—

নয়ন। সে তো ঠিক কথা বাবা।

কতকগুলি খুচরা জিনিষ-পত্তর দেখাইয়া নয়নতারা কহিলেন।

নয়ন। এই গুলোর কী করা যায় বল্ তো?

হর। ঝুড়ি আর কিছু দড়ি না হলে তো ওগুলো নেওয়ার সুবিধা হবে না মেজ-মা। আচ্ছা, আমি বাজার থেকে আসবার সময় দড়ি আর ঝুড়ি নিয়ে আসবো'খন।

নয়ন। আচ্ছা। তাহলে তোমার উপরেই ভার রইল বাবা।

হরলাল চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া সিদ্ধেশ্বরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। এত গোছগাছ কিসের মেজ-বৌ।

নয়ন। দেখতেই তো পাচ্ছো ?

সিদ্ধে। তা তো পাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে ?

নয়ন। যেখানে হোক।

সিদ্ধে। তবু কোথায় শুনি ?

নয়ন। কী করে জানব দিদি কোথায়। উনি বাসা ঠিক করতে গেছেন, ফিরে না এলে তো বলতে পারছি না।

সিদ্ধে। তোমার ভাসুর শুনেছেন ?

নয়ন। তাঁকে শুনিয়ে আর কী হবে, যার শোনার দরকার সেই ছোটগিন্নী শুনেছেন ? আর আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।

সিদ্ধে। সে কি ! শৈল আজ সকাল থেকে ত একবার নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় পায়নি। সে আবার কখন এলো ?

নয়ন। তা হবে, তাহলে হয়তো আমারই দেখার ভুল হয়েছে।

সিদ্ধে। দেখ মেজ-বৌ, এই ভুল দেখা আর ভুল শোনাতে—আমরা যে ভুল করে বসি, তার কোনদিনই সংশোধন হয় না। আমার দুঃখ মেজ-বৌ এমন ভাশুরের মান-মর্য্যাদা তোমরা বুঝলে না। বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এমন ভাশুর পাওয়া যায়।

নয়ন। আমরা কী সে কথা জানিনে দিদি ? দুজনে দিবারাত্র বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড় জা মেলে। তোমার বাড়ীতে আমরা ঘর দোর ঝাঁট দিয়ে ঝি-চাকরদের মত থাকতে পারি কিন্তু এখানে আর এক দণ্ডও বাস করতে পারব না।

সিদ্ধে। এ আমার বাড়ী নয় মেজ-বৌ, এ বাড়ী তোমাদেরই, কোন মতেই আমি তোমাদের কোথাও যেতে দিতে পারব না।

নয়ন। যদি কখনো ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তাহলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাকব। কিন্তু এখানে আর একটি দিনও থাকতে বলো না। (কাঁদিয়া) আমার অতুল—হয়েছে সকলের চক্ষুশূল। অনুমতি দাও তাকে নিয়ে আমরা চলে যাই।

সিদ্ধে। সে কী কথা মেজ-বৌ, দৈবাৎ সেদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে, সে কথা কী মনে রাখতে আছে?

নয়ন। কোন কথাই মনে রাখতে পারিনে বলে, কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি! ওই যখনই হলো তখনই হাউ-মাউ করে কেঁদে কেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে, আমি যে গঙ্গাজল—সেই গঙ্গাজল—একটা কথাও আর আমার মনে থাকে না। আমি তো সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু রাগ করতে পারবে না দিদি, তুমি যতই বল,—আমাদের ঐ ছোট বৌটি বড় সহজ মেয়ে নয়। বাড়ীর সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ যেন আমার অতুলের সঙ্গে কথা না কয়।

সিদ্ধে। সে কি!

নয়ন। বাছা মুখ চুণ করে বেড়ায় দেখে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম,—না দিদি এখানে আর আমাদের থাকা চলবে না। এক বাড়ীতে থেকে, ছেলে আমার এমন মন গুমরে বেড়ালে—ব্যামোতে পড়বে। তার-চেয়ে আমাদের অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়োয়, আর আমিও দুটো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

হরিচরণ ব্যস্তভাবে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল।

হরি। মা সরকার জেঠামশাই এসেছেন, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

সিদ্ধে। তাঁকে একটু পরে আসতে বলে দে হরি।

হরি প্রস্থানোদ্যত, সিদ্ধেশ্বরী ডাকিয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। হরি শোন ?

হরি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

তোরা অতুলের সঙ্গে কেউ কথা কস্‌নে কেন রে ?

হরি। ও ছোটলোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে মা ? বড়দাকে যা মুখে আসে, তাই বলে। ছোট খুড়িমাকে গালাগালি দেয় !

সিদ্ধে। যা হয়ে গেছে—তার আর উপায় কী হরি। যাও—ডেকে অতুলের সঙ্গে কথা কও গে।

হরি। ওর কথা কইবার লোকের অভাব হবে না মা। পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক্ ঢের বন্ধু-বান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন।

নয়ন। তোর মুখও তো নেহাৎ কম নয় হরি ? তুই আমাদের এমন কথা বলিস্। আচ্ছা, সেই ভালো, আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। দেখি, আবার হরলাল দড়িঝুড়ি নিয়ে এলো কিনা ? বাকী জিনিষগুলো আবার গুছিয়ে নিতে হবে তো।

হরি। অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মলবে—নাকখৎ দেবে—তবে আমরা কথা বলব। তা নইলে, ছোট খুড়িমা—না মা, সে আমরা কেউ পারবো না।

প্রস্থান

নয়ন। ছেলেদের কথা শুন্‌লে ত দিদি! ছোট-বৌ যদি ছেলেদের একবার ডেকে বলে দেয়, তা হলেই তো সমস্ত গণ্ডগোল মিটে যায়।

সিদ্ধে। তা যায়।

নয়ন। তবেই দেখ দিদি, এই সব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে ? না ভালবাসবে ? বলা দায় কি ভবিষ্যতের কথা, তোমার

নিজের ছেলেরাই তোমার কথা শোনে না, কিন্তু আমার অতুল তোমরা যাই বলো, তার মা অন্ত প্রাণ! আমি বল্লে সাধ্যি কী তার এই হরিচরণের মতো ঘাড় নেড়ে চলে যায়?

সিদ্ধে। তা বটে? এ বাড়ীর মণি থেকে পটল পর্য্যন্ত সবাই ওই শৈলর বশে। সে যা বলবে তাই করবে, আমাকে কেউ মানে না।

নয়ন। কিন্তু এটা কী ভাল?

সিদ্ধে। ভাল নয় তা মানি, কিন্তু করবোই বা কী?

উচ্চকণ্ঠে

ওরে ও নীলা, নীলা—

নেপথ্যে নীলা। কী মা।

সিদ্ধে। তোর ছোট খুড়িমাকে একবার ডেকে দে তো।

নয়ন। ছোটবৌকে আবার আমার এখানে ডাকছ কেন দিদি?

সিদ্ধে। আজ আমি তাকে ডেকে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতে চাই, সে কী চায়।

নয়ন। সে কী চায় সে তুমি জিজ্ঞাসা না করলেও, আমি বলতে পারি।

সিদ্ধে। কিন্তু তার মতেই যে সব সময় চলতে হবে তার তো কোন মানে নেই মেজবৌ। আজ তাকে আমি সোজা কথা সোজাসুজিভাবে জিজ্ঞেস করবো। দেখি কি জবাব দেয়?

শৈলজা ঘরে প্রবেশ করিল

শৈল। আমায় ডাকছিলে দিদি?

সিদ্ধে। হ্যাঁ। তোর কী মত, মেজবৌ এরা এখান থেকে চলে যাক্?

শৈল। সে কি! মেজদি চলে যাবেন? কেন?

সিদ্ধে। না গিয়ে আর উপায় কি বল্। তোর হুকুমে ছেলেরা কেউ

অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, খেলা করে না। ছেলেমানুষ তার দিনটাই বা কাটে কি করে বল্? আর দিবারাত্র ছেলের শুক্‌নো মুখ দেখে বাপ মাই বা এখানে বাস করে কী করে? তুই তাহলে ওদের এ বাড়ীতে রাখতে চাস নে?

নয়ন। তা হলে সবদিক দিয়েই বোধহয় ছোট বৌয়ের ভাল হয়।

শৈলজা। আমার আর ভালো মন্দ কী? কিন্তু ছেলেদের যে ভাল হবে না, তা আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি। অমন ছেলের সঙ্গে আমি এ বাড়ীর কোন ছেলেকেই মিশ্‌তে দিতে চাইনে। ও যে কী মন্দ হয়ে গেছে তা মুখে বলা যায় না—

নয়ন। হতভাগী মায়ের মুখের সাম্‌নে অমন করে তুই ছেলের নিন্দে করিস্? মুখ যেন তোর খসে যায়। দূর্ হ—দূর্ হ—আমার ঘর থেকে—

শৈলজা। আমি ইচ্ছে করে কখনো তোমার ঘরে পা দিইনে মেজদি। কিন্তু এম্‌নি করেই তুমি ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ! আজ বুঝতে পারছ না, একদিন পারবে। প্রস্থান

নয়ন। শুনলে দিদি কথাগুলো, শুনলে তো না দিদি! আমাদের ছেড়ে দাও আমরা চলেই যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি আমাদের ছাড়তে চাইছ না। কিন্তু ছোটবৌয়ের এতটুকু ইচ্ছে নয় যে আমরা এ বাড়ীতে থাকি।

সিদ্ধে। তুমি কিছু মনে করো না মেজবৌ। তা ওরা যা বল্‌ছে অতুল কেন তাই করুক না? সেও তো ভাল কাজ করেনি মেজবৌ।

নয়ন। আমি কী বলেছি যে সে ভাল কাজ করেছে? জ্ঞান-বুদ্ধি থাকলে কেউ কী বড় ভাইকে গালাগালি দেয়? আমি না হয় তার হয়ে তোমাদের সকলের কাছে নাকখৎ দিচ্ছি।

নয়নতারা মাটিতে নাকখৎ দিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বাধা দিলেন।

সিদ্ধে। ও কি মেজবৌ! ছি ছি! ও কি করছ—

নয়ন। তাকে তোমরা মাপ কর দিদি। তার মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!

শৈলজার প্রবেশ

শৈলজা। সরকার ম'শায়ের বাড়ীতে বড় বিপদ, তিনি কিছু টাকা চান। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

সিদ্ধে। যা ভাল হয় তোরা করগে যা—আমি তার কি জানি?

শৈলজা। বারে! কী দেওয়া হবে না হবে, তুমি না বল্‌লে আমি কী করে বার করে দেব?

সিদ্ধে। যেমন করে চব্বিশ ঘণ্টা সিন্দুক খুলে টাকা বার করছিস, তেমনি করে বার করে দিগে যা। তোর ওপর আমার আর এতটুকু—পিত্তিছেদ্দা নেই। তোর ব্যবহারে আজকাল তোর সঙ্গে কথা কইতেও আমার ঘেন্না হয়। আপনার জা-দেওরকে তাড়িয়ে দিয়ে যে তোদের নিয়ে মাথায় করে নাচব এ তুই মনেও ঠাঁই দিস্‌নে। আমার সংসারে যদি মানিয়ে চলতে না পারিস্ যেখানে তোদের সুবিধে হয় চলে যা—আমি আর পারি না। পারি না।

সিদ্ধেশ্বরী কোন প্রকারে কান্না চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।
শৈলজা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গিরীশের বসিবার ঘর

ঘরের মধ্যস্থলে একটি সেকরেটেরিয়েট টেবিল পাতা। টেবিল ঘিরিয়া কয়েকখানি চেয়ার সোফা ইত্যাদি দেখা যাইতেছে। কয়েকটি আলমারী ঠাসা আইন পুস্তক। টেবিলের ওপর ইতঃস্তত ব্রীফ্ ছড়ান। গিরীশ সবেমাত্র কোর্ট হইতে আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া চেয়ারে বসিয়া মনোযোগ সহকারে ব্রীফ্ পাঠ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর পুরাতন সরকার গণেশ চক্রবর্ত্তী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, গিরীশ গণেশের আসা টের পাইলেন না। কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করিয়া গণেশ ডাকিল—

গণেশ। বাবু!

গিরীশ নিরুত্তর

বড় বাবু!

গিরীশ। (গণেশের দিকে চাহিয়া) কে? ও! গণেশ! কী খবর?

গণেশ। বাড়ীতে বড্ড অসুখ, দু'এক দিনের জন্যে দেশে যেতে চাই।

গিরীশ। তা বেশ তো! বড় বৌকে বলে যাও।

গণেশ। আজ্ঞে বড় মাকেই বলতে গিয়েছিলাম—

গিরীশ। বলতে গিয়েছিলে তো বললে না কেন?

গণেশ। আজ্ঞে, তিনি বড় ব্যস্ত তাই—

গিরীশ। তোমাদের ওই বড় মা-টি অতিশয় ব্যস্তবাগীশ! আর সেই-জন্যেই তো রোগ সারছে না। ডাক্তারে বলছে—ওষুধ পত্তি নিয়মিত খেতে আর চুপ চাপ শুয়ে থাকতে। তা নয়, সারাদিন ঘুরপাক্ খাচ্ছেন আর রোগটিকে বাড়াচ্ছেন।

গণেশ। আজ্ঞে, তা নয়। বড় মা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না, ঘরেই বসে আছেন।

গিরীশ। বসে আছেন তো বল্‌লে না কেন?

গণেশ। আজ্ঞে বলব কী! দেখলাম বড্ড গণ্ডগোল—

গিরীশ। গণ্ডগোল! ঐ এক হয়েছে। দিনরাত্রি কেবল গণ্ডগোল আর গণ্ডগোল। আরে বাপু, গণ্ডগোলটা কিসের? গণ্ডগোল করলেই গণ্ডগোল! না করলেই নয়।

গণেশ। আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা। কিন্তু কিছু টাকারও যে দরকার ছিল।

গিরীশ। দরকার তো হবেই। বাড়ীতে অসুখ বিসুখ টাকার দরকার হবে না? যাও যাও—বড় গিন্নীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে চলে যাও।

গণেশ প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় সিদ্ধেশ্বরী ঘরে প্রবেশ করিলেন। গণেশকে দেখিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। তুমি কী টাকা চাইছিলে গণেশ?

গণেশ। হ্যাঁ মা।

সিদ্ধে। নীলার কাছে টাকা রেখে দিয়ে এসেছি। নিয়ে যাও।

গণেশের প্রস্থান

গিরীশ। আমার কাছে এসে বলে কিনা, টাকা—ছুটি, আমি ওসব কী জানি বাপু। তাই তো গণেশকে বল্‌ছিলাম ওসব সংসারের ব্যাপার—আমি কী জানি।

সিদ্ধে। কিন্তু না জানলে তো আর হবে না। এখন থেকে জানতেই হবে। এই যে আজ মেজবৌ আর একটু হলেই চলে যাচ্ছিলো। বিছানা পত্তর বাঁধা-ছাঁদা সব ঠিক ঠাক্—

গিরীশ। সেকি! কেন?

সিদ্ধে। এমনিই তো মেজবৌয়ের সঙ্গে ছোটবৌয়ের এক তিলার্দ্ধও বনে না। তার ওপর ছোটবৌ বাড়ীর সব ছেলেদের শিখিয়ে দিয়েছে—

কেউ যেন অতুলের সঙ্গে কথা না কয়; সে বেচারা এই কদিনে শুকিয়ে যেন অর্দ্ধেক হয়ে গিয়েছে। শৈল যে এইভাবে এখন থেকে ভায়ে ভায়ে অসদ্‌ভাব করিয়ে দিচ্ছে, বড় হলে এরা তো লাঠা-লাঠি মারামারি করে বেড়াবে! এটা কি ভাল?

গিরীশ। না না, খারাপ! খুব খারাপ।

সিদ্ধে। ওর জন্যেই তো সেদিন মণি—অতুলকে অমন করে ঠেঙ্গালে। আচ্ছা সে-ও মেরেছে, ও-ও গালাগালি দিয়েছে—চুকে গেল, আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে বারণ করা?

গিরীশ। (ব্রীফ হইতে মুখ তুলিয়া) ঠিকই তো!

সিদ্ধে। আজ তুমি মণি আর হরিকে ডেকে বলে দিও, তারা যেন অতুলের সঙ্গে কথা বলে। নইলে ওরা চলে গেলে পাড়ার লোকে যে আমাদের মুখে চূণ কালী দেবে। সত্যিই তো আর ছোট বৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই ভাজকে তুমি ছাড়্‌তে পারবে না।

গিরীশ। (অন্যমনস্ক-ভাবে) তা তো নয়ই?

সিদ্ধে। আর দেখ, এখন থেকে সংসারের দিকে একটু নজর দেবার চেষ্টা করো।

গিরীশ। করবো।

সিদ্ধে। করবে যা, তা আমি জানি! আমার শুধু বলে মুখ নষ্ট!

গিরীশ। না না, নষ্ট হবে কেন? বল না আমি শুনছি—

সিদ্ধে। এই যে ছোট ঠাকুরপো, কোন কিছু রোজগারের চেষ্টা করবে না চুপ-চাপ বসে আছে। এমনি করেই কী ওর চিরকাল চলবে?

গিরীশ। ঠিক কথা! আমি আচ্ছা করে ধমকে দেবো'খন?

সিদ্ধে। ধমকে যা দেবে, তা আমার জানা আছে। তোমার ওই পর্য্যন্তই—

গিরীশ। না না, তোমার সাম্‌নেই এখুনি তাকে ধম্‌কে দিচ্ছি। ওরে কে আছিস্, রমেশকে একবার ডেকে দে তো—

হরিশের প্রবেশ

হরিশ। রমেশকে ডাকছেন দাদা ?

গিরীশ। হ্যাঁ! তাকে রীতিমত ধমকে দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একে বারে জানোয়ার হয়ে গেল!

হরিশ। ইংরেজীতে একটা কথা আছে না! Idle brain is devils workshop। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। এও হয়েছে—ঠিক তাই।

গিরীশ। ঠিক ঠিক।

হরিশ। আর তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় দাদা, সে আর এখন ছেলে মানুষটি নয় যে সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়াবে আর খবরের কাগজ মুখে করে দেশ উদ্ধার করবে।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। আমাকে ডাকছিলেন দাদা ?

গিরীশ। হ্যাঁ। তুই অতুলের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ কেন ?

রমেশ। আমি ?

গিরীশ। হাঁ হাঁ, তুই—

রমেশ। (আশ্চর্য্য হইয়া) ঝগড়া করেছি ?

গিরীশ। হ্যাঁ। আল্‌বৎ করেছিস্, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি মন্দ করেছিস্।

রমেশ। শুনেছি বটে! কিন্তু ঝগড়ার সময় আমি ত ছিলুম না দাদা।

গিরীশ। নিশ্চয়ই ছিলি!

রমেশ। না দাদা, বিশ্বাস করুন; আমি ছিলুম না—

গিরীশ। আমি, হরিশ বাড়ীর সকলে ছুটে গেলাম, আর তুই ছিলি না?

রমেশ। বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি ছিলুম না।

গিরীশ। তবে বড় বৌ কী মিছে কথা বল্‌ছেন?

রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিলে—
সিদ্ধেশ্বরী গর্জ্জিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। তোমার কী ভীম-রতি ধরেছে? ঝগড়া ঝাঁটি যখন হয় তখন তো তুমি ছুটে গিয়েছিলে। ছোট্ ঠাকুরপোকে তখন তুমি দেখতে পেয়েছিলে কি? সে কি ছিল সেখানে?

গিরীশ। না, তা তো ছিল না বলেই, মনে হচ্ছে বটে—

সিদ্ধে। তবে? কখন তোমাকে বল্‌লুম ছোট্ ঠাকুরপো অতুলকে গালাগালি দিয়েছে?

গিরীশ। ও! না না, সে বুঝি ছোট বৌমা? তা ছোট বৌমাই বা কেন গালাগালি করবেন শুনি?

সিদ্ধে। (সক্রোধে) সে করে নি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বলবো আমি। তুমি তার জন্যে ছোট ঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্ছ কেন?

গিরীশ। আচ্ছা তাই যেন হলো। (রমেশের প্রতি) কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে আমার চার চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি! আর দেখ্‌গে যা—বাগবাজারের খাঁ-দের এই খড়ের দালালীতে তারা ক্রোড়-পতি হয়ে গেল।

হরিশ। খড়ের দালালী?

গিরীশ। হ্যাঁ, খড়ের দালালী।

রমেশ। না দাদা, খড়ের নয়—পাটের।

গিরীশ। তারা আমার মক্কেল আর আমি জানি নে তুমি জান। খড়ের দালালী করেই তারা বড়লোক হয়েছে। জাহাজ জাহাজ খড় বিলেত পাঠাচ্ছে—

রমেশ। আমি যতদূর জানি, খড় নয় দাদা, ওটা পাট।

গিরীশ। আচ্ছা না হয় পাটই হ'লো? এই পাটের দালালী করে তুই কি দু'শো একশও আনতে পারিস্ নে। তোমাদের তো আমি চিরকাল বসে বসে খাওয়াতে পারবো না। 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার টাকা লোকসান গেছে, যাক্ কুছ্ পরোয়া নেই। আচ্ছা আর চার হাজার নাও, না হয় আরও চার হাজার নাও। তাই বলে আমি ব্যাটা খেটে মরবো, আর তুমি যে বসে বসে খাবে? তা হবে না।

হরিশ। পাটের দালালী তো আর করলেই হয় না, শিখতে হয়, বার বার এইভাবে টাকা নষ্ট করে আর লাভ কী দাদা!

গিরীশ। তা ঠিক বটে। আমি পাটের দালালী-টালালী বুঝিনে, তোমাকে খড়ের দালালীই কাল থেকে সুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক্ দেবো, চার হাজার টাকার খড় কিনবে আর চার হাজার টাকা জমা রাখবে। এই টাকাটা নষ্ট হলে—তবে ঐ জমার টাকায় হাত দেবে। তার আগে নয়। বুঝলে!

রমেশ। (ঘাড় নাড়িয়া) যে আজ্ঞে।

গিরীশ। যাও।

রমেশের প্রস্থান

হরিশ। এই আট হাজার টাকাটা দেওয়া কী ঠিক হলো দাদা?

গিরীশ। কেন নয়? না দিলে কুঁড়ের মতো বসে থাকবে যে।

হরিশ। কিন্তু এই আট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কী বল বৌঠান্? এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার ব্যবসা করবার জন্য টাকা দিতে যাচ্ছেন?

গিরীশ। তা হলে তুমি কী করতে বল?

হরিশ। রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কী? আট হাজারই দিন্ আর আট লাখই দিন্ আটটা পয়সাও যে ও ফিরিয়ে আনতে পারবে না, এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জ্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি।

গিরীশ। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেছে হরিশ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই ত জলে ফেলে দেওয়া। ও আবার কী একটা মানুষ!

হরিশ। তার চেয়ে আমি বলি কী রমেশ বরং একটা চাকরী বাকরী জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করুক। খুড়্তুতো ভাই হিসাবে আমাদের যা করা উচিত ছিল—আমরা তা করেছি, এখন ওর যেমন ক্ষমতা তেমনিই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়ানোর জন্যে মাসে মাসে আমাকে পঁচিশ টাকা করে দিতে হচ্ছে। সে কাজটাও তো ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও ত ও আমাদের কতকটা সাহায্য করতে পারে, কী বলো বৌঠান্?

গিরীশ। ঠিক্ ঠিক্। ঠিক্ কথা বলেছে হরিশ, কাঠ বেড়ালী দিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধে ছিলেন, দেখছ বড়বৌ—হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেছি কিনা ছেলেবেলা থেকেই ওর বুদ্ধিটা ভারি প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যতটা ভেবে দেখতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। আমি তো আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছিলাম আর কী! কাল থেকে রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ

করে দিক, খবরের কাগজ মুখে নিয়ে আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

সিদ্ধে। টাকাটা কী তবে দেবে না না-কি?

গিরীশ। নিশ্চয়ই না। তুমি বল কী, আবার আমি তাকে টাকা দিই কখনো?

সিদ্ধে। তা হলে এইভাবে তাকে আশা দেওয়া ঠিক হয় নি।

হরিশ। বল্‌লেই যে দিতে হবে, তার তো কোন মানে নেই বৌঠান! আমিও তো দাদার সহোদর, আমারও তো একটা মতামত নেওয়া চাই। সংসারের টাকা নষ্ট হলে আমারও তো গায়ে লাগে—

সিদ্ধেশ্বরী ম্লান হাসিয়া

সিদ্ধে। তা বুঝেছি; ওইটাই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো!

তৃতীয় দৃশ্য

শৈলজার শয়ন কক্ষ

ঘরের মধ্যস্থলে খাটপাতা, একপাশে আলমারী অপরদিকে আন্‌লা এবং সাংসারিক জিনিষপত্তর দেখা যাইতেছে। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। খাটের ওপর রমেশ চুপচাপ বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। শৈলজা ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শৈল। হ্যাঁ গা! বড়ঠাকুর তখন তোমায় ডাকছিলেন কেন?

রমেশ। এমনি!

শৈল। ও! অনেক দিন বুঝি দেখা সাক্ষাৎ হয়নি, তাই দেখেই বিদেয় দিলেন।

রমেশ। না না, কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তাও ছিল।

শৈল। সেই প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা কী তাই তো জানতে চাইছি?

রমেশ। ব্যবসাটা আবার চালু করার জন্যে দাদা আরো হাজার আস্‌টেক টাকা দিতে চান। তা দাদাকে তো জানো—কোন কথাই তাঁর মনে থাকে না। সেবার টাকা দিলেন—পাটের ব্যবসা করার জন্যে; এখন বল্‌ছেন—খড়ের।

শৈল। তা পাটকে খড় বলেই মেনে নিয়ে এলে তো?

রমেশ। তা নিয়ে এলাম বৈ কি। ঐ নিয়ে তো আর দাদার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না।

শৈল। তা বেশ করেছো। কী ঠিক করলে? ব্যবসাই করবে?

রমেশ। তা ছাড়া আর উপায় কী? দাদা যখন বলছেন।

শৈল। কিন্তু আমি বলি কী, টাকা নিয়ে ব্যবসা না করে, একটা চাকরী বাকরী জুটিয়ে নেবার চেষ্টা কর।

রমেশ। কিন্তু চাকরী করায় দাদা কী মত দেবেন—

শৈল। সরাসরি মত দেবেন কিনা জানি না। তবে চাকরী যদি তুমি জুটিয়ে নিতে পার, তা হলে অমত করবেন বলেও আমার মনে হয় না।

রমেশ। কেন? ব্যবসা করায় তোমার আপত্তি কী?

শৈল। ব্যবসা করায় আমার আপত্তি নয়—বড় ঠাকুরের কাছে টাকা নেওয়াতেই আমার আপত্তি। মেজদি, মেজ বড়ঠাকুর যখন এখানে ছিলেন না তখন বড়ঠাকুর যা দিয়েছেন, নিয়েছো। কিন্তু আজকে তৃতীয় পক্ষ যখন উপস্থিত, তখন দাতা বা গ্রহীতা কারুরই দেওয়া বা নেওয়া উচিত নয়।

রমেশ। কিন্তু আমি তো চাই নি, দাদা ইচ্ছে করেই তো দিচ্ছেন।

শৈল। বড়ঠাকুর শিবতুল্য মানুষ! তাঁর তুলনা হয় না, তিনি চান সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্। কিন্তু তিনি দিতে চাইলেও তোমার তা নেওয়া উচিত হবে না। বড়ঠাকুর যে টাকা দিতে চাইছেন, সে টাকা এখন আর তাঁর একার নয়, ওতে মেজ বড়ঠাকুরেরও ভাগ আছে। দিদি তো আজ স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছাড়া তোমার সঙ্গে তাঁদের আর কোন সম্পর্কই নেই। ভুলে যেও না—তুমি তাঁদের খুড়তুতো ভাই।

রমেশ। এতদিন পরে আজ একথা উঠছে কেন শৈল?

শৈল। এতদিন বুঝতে পারিনি, দিদি আমার আপনার জা নন্, আর বড়ঠাকুর তোমার আপনার ভাই নন্। দিদি আজ এই কথাটা বিশেষ করে জানিয়ে দিয়েছেন বলেই তোমাকে বললাম।

রমেশ। বড় বৌ!

শৈল। হ্যাঁ। দিদি আজ আমাকে সোজাসুজি বল্লেন—আপনার জা দেওরকে পর করে দিয়ে যে তোমাদের মাথায় নিয়ে নাচব তা মনেও করো না—

রমেশ। ও বড় বৌ রাগের মাথায় কী বলেছেন, ও কথা ধরতে গেলে কী চলে? আর তোমাদের খুটমুট্ তো লেগেই আছে।

শৈল। আমাদের খুটমুট্ লেগে আছে, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু তার মধ্যে কোনদিন সম্পর্কের ব্যবধান দেখা দেয়নি।

নীলার প্রবেশ

নীলা। ছোটখুড়িমা, অতুল আমায় ডেকে কী বল্‌ছে জান?

শৈল। কী বলছে রে?

নীলা। বল্‌ছে—ছোটকাকাকে আমায় পড়াতে হবে। আমার

মাষ্টারকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর মাষ্টারকে যে পঁচিশ টাকা করে মাইনে দেওয়া হতো, সেই টাকাটা দেওয়া হবে—ছোটকাকাকে। আমার শুনে এমন রাগ হলো।

শৈল। এতে রাগ করবার কী আছে নীলা? মাষ্টারী সে তো ভাল কাজ।

নীলা। ভাল না ছাই। ছোটকাকা শুধু শুধু ওর মাষ্টারী করতে যাবেন কেন? ছোটকাকা কী মাষ্টার? সে আরো যে সব কথা বলেছে,—সে আর তোমায় কী বলবো?

রমেশ। অতুল আর কী বলেছে নীলা?

নীলা। সে ভারি খারাপ কথা ছোটকাকা, এবার থেকে ওর সঙ্গে আমরা কেউ কথা বলবো না।

শৈল। ছিঃ! ও কথা কি বলতে আছে মা?

নীলা। না বলতে নেই বৈ কি? ও কেন, ও সব কথা বলবে?

শৈল। কী কথা বলেছে নীলা?

নীলা। বলে কী ঐ মাইনের পঁচিশ টাকাও ছোটকাকার হাতে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে মার হাতে, সংসার খরচের জন্যে। এর পরেও তার সঙ্গে তোমরা কথা বলতে বলো—এরকম কথা যে বলে, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই কথা বলবো না—কিছুতেই না—

প্রস্থান

শৈল। শুনলে?

রমেশ। শুনলাম। কিন্তু করব কি? এ নিয়ে দাদার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারব না।

শৈল। ঝগড়া করতে আমিও তোমায় বলি না। আমি বলি, এমন একটা উপায় কর, যাতে আমরা এই ঝগড়াকে এড়িয়ে চলতে পারি।

রমেশ। সেই উপায়ই আমি করব শৈল।

শৈল। আমি জানি তুমি করবে, আর সেই-জন্যেই আমি তোমায় বট্ঠাকুরের কাছে টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে বারণ করেছিলাম।

রমেশ। তখন বুঝতে পারিনি শৈল। তখন ভেবেছিলাম বৌঠানের ওপর অভিমান করেই তুমি বলছ। কিন্তু এখন দেখ্ছি—এ তা নয়—এ পাকা ইমারতে ফাটল ধরেছে।

চতুর্থ দৃশ্য

বাটীর অন্দরমহল। রান্নাঘরের সম্মুখস্থ দালান

নীলা দালানে বসিয়া গান গাহিতেছে, পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরী। রান্নাঘরের মধ্যে শৈলজা রান্নার কাজে ব্যস্ত। তখন বেলা ১০টা—১১টা।

নীলার গান

কে যাবে মথুরাপুর, কার লাগি রব।
এসব দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥
হাত কলম করি, নয়ন করি দোত।
কলিজা কাগজ করি লিখি চাঁদ মুখ॥
কেহ ত না কহে রে আওব তোর পিয়া।
কতনা রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা প্রবেশ করিলেন

নয়ন। এ কি দিদি! এমন করে বসে আছ যে? শরীর কী আজ বড্ড বেশী খারাপ মনে হচ্ছে? ডাক্তারকে খবর দেবো?

সিদ্ধে। না না। কিছু হয়নি, আমি আজ ভালই আছি।

নয়ন। তোমার কথা তো? দেখি, কেমন ভাল আছ?

কপালে হাত দিয়া

সিদ্ধে। নিত্যি নিত্যি কি আর দেখ্‌বি মেজবৌ। সত্যিই বলছি—আজ আমার জ্বর হয়নি।

নয়ন। তা অমন করে বসে আছো কেন দিদি? বেলা হলো—যা হোক্ চারটি মুখে দেবে চলো।

সিদ্ধে। বেলা আর কোথায় মেজবৌ, এই ত সবে এগারোটা।

নয়ন। এগারোটা কী সোজা কথা দিদি! তোমার অসুখ শরীরে যে বেলা নটার ভেতরই খাওয়া-দরকার।

সিদ্ধে। তা হোক মেজবৌ, আমি কোনদিনই এত শীগ্‌গির খাই না।

নয়ন। এই জন্যেই তো পিত্তি পড়ে শরীরের এই অবস্থা! আমার হাতে হেঁসেল্‌ থাকলে আমি কি ন-টা পেরোতে দিই? তুমি না বাঁচলে কার আর কী? আমাদেরই সর্ব্বনাশ!

সিদ্ধে। তুমি আপনার জন বলেই আজ এ কথাটা বল্‌লে মেজবৌ! নইলে আমার আর কে আছে?

নয়ন। না দিদি, আমি বেঁচে থাকতে তুমি যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা হবে না।

শৈলজা খুন্তি হাতে রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া কহিল।

শৈল। এখন কী খেতে দেবো?

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না, নয়নতারা বলিয়া চলিলেন।

নয়ন। এঁরা যেমন দুটিতে সহোদর, তেমনি আমরাও তো দুটী বোন। যেখানে যত দূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যেমন নাড়ীর টানে কেঁদে মরবো, আর কী কেউ তেমন করে কাঁদবে?

নীলা বিরক্তভাবে

নীলা। আঃ! উত্তর দাও না মা, ছোটখুড়িমা যে জিজ্ঞেস করছেন, তুমি এখন খাবে না, না?

সিদ্ধে। (বিরক্তভাবে) আহা! মেয়ের মুখ দেখ না, বল্‌ছি তো এখন খাবো না।

শৈলজা রান্নাঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন।

নয়ন। এই যে তুমি বল্লে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর সত্যিকারের কেউ আপনার জন নেই এ কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেয়ো না।

সিদ্ধে। একি ভুলবার কথা মেজবৌ! এতদিন তোমাকে চিন্‌তে পারিনি তাই।

নয়ন। দোষ আমার দিদি! আমিই তোমাকে চিনিনি। আজ যদিই বা জানতে পারলুম, আমরা তোমার পায়ের ধূলোর যোগ্য নই। কিন্তু সে কথা জানাবো কী করে দিদি, তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করবো ভগবান তো সেদিন দিলেন না। আমরা হয়েছি ছোটবৌয়ের দুচোক্ষের বিষ!

সিদ্ধে। অত যদি তার চক্ষুঃশূল হয়ে থাকে, তা হলে সে যেন তার ছেলেপুলে নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে যায়। আমি তার সাত গুষ্টিকে দুধে ভাতে খাওয়াবো কি নিজের সর্ব্বনাশ করার জন্যে?

শৈলজা ইতিমধ্যে রান্নাঘরের ভিতর হইতে বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধেশ্বরী বা নয়নতারা তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। নীলার কিন্তু চোখ এড়াইল না। সে মায়ের কথা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরী যথারীতি বলিয়া চলিলেন।

সিদ্ধে। খুড়তুতো ভাই ভাজ! তাদের ছেলেপুলে—এই তো সম্পর্ক!

ঢের খাইয়েছি, ঢের পরিয়েছি—আর না, দাসী চাকরের মতো মুখ বুঁজে আমার সংসারে থাকতে পারে থাক্, না হয় চলে যাক্।

নীলা। মা কী বক্‌ছো পাগলের মতো! আঃ! চুপ করো না।

শৈলজা ধীরে ধীরে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সিদ্ধে। আমরা দু-জায়ে কথা বল্‌ছি তা তোর কী লা! তুই চুপ করে থাক্। ছোট মুখে বড় কথা!

নয়ন। ওদের আর দোষ কী দিদি, যেমন দেখ্‌ছে তেমনি শিখ্‌বে তো? কথায় কথায় অনেক বেলা হল; এইবার খাবার সময় হয়েছে, আমি তোমার খাবার জায়গা করে দিয়ে আসি, আর বেলা করো না লক্ষ্মীটি!

নয়নতারার প্রস্থান

সিদ্ধেশ্বরী আপন মনে বলিতে লাগিলেন।

সিদ্ধে। হ্যাঁ। আপনার জন বটে মেজবৌ! সে না থাকলে দেখছি এবার আমাকে বে-ঘোরে মরতে হতো। এমনি সেবাযত্ন আমার মায়ের পেটের বোন থাকলেও করতে পারতো না। আর অপরকে খাওয়ানো পরানো—শুধু অধর্ম্মের ভোগ; ভস্মে ঘি ঢালা! মেজবৌকে আমার মুখের কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ হাঁ করে এসে পড়ে! আমার এমন পোড়া কপাল! যে এমন মানুষকে আমি পরের ভাঙ্‌চিতে পর মনে করেছিলুম। মার কাছ থেকে কদিন হোল একখানা চিঠি এসেছে—তা যে কাউকে দিয়ে একটু পড়িয়ে শুনবো, আমার সে উপায়ও নেই। অপরকে খাওয়ানো পরানো তবে কিসের জন্যে?

নীলা। মেজখুড়িমা সে চিঠিটা তোমাকে দু'তিনবার পড়ে শুনালেন যে মা! আবার কবে নতুন চিঠি এল?

সিদ্ধে। তুই সব-কথায় গিন্নিপণা করতে যাস্‌নে নীলা! চিঠি শুনলেই হলো, তার জবাব দিতে হবে না? কেন? তোর ছোটখুড়ি কী মরেছে—যে পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাবো?

নীলা। চিঠি লেখাবার আর কী কেউ নেই মা যে, এই আজ সংক্রান্তির দিনে তুমি আমার ছোটখুড়িমাকে মরিয়ে দিচ্ছ?

সিদ্ধে। তুই যে আমায় অবাক করলি নীলা! বালাই ষাট্। মরবার কথা আবার আমি কখন বল্‌লুম? (কাঁদিয়া) পেটের মেয়ে সেও আমাকে মুখ নাড়া দেয়? কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলে পিঠে করে মানুষ করলুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না! আমার সঙ্গে কথা কয় না। এত যে আমি রোগে ভুগ্‌ছি তবু তো আমার মরণ হয় না? আজ থেকে আমি যদি এক ফোঁটা ওষুধ খাই তো আমার অতি বড়—দিব্যি।

সহসা নয়নতারার প্রবেশ

নয়ন। কেন শুধু শুধু দিব্যি-দ্বিপান্তর করতে যাচ্ছ দিদি? একখানা চিঠির জবাব লেখাবার জন্যে অত খোসামোদ করা কেন? আমাকে হুকুম করলে এতক্ষণে অমন দশখানা চিঠির জবাব লিখে দিতে পারতুম। এস—খাবে এস।

নয়নতারা জোর করিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে টানিয়া লইয়া গেল। অপর দিক হইতে শৈলজাকে লইয়া নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল।

নীলা। মার কথায় তুমি কিছু মনে ক'রোনা ছোটখুড়িমা, অসুখে ভুগে ভুগে মা যেন কী রকম হয়ে গেছেন। আর তার ওপরে মেজ খুড়ীমা অষ্টপ্রহর খিট্‌ খিট্‌ করছেন। ওঁরা না এলে ভালই হতো—

শৈল। ওকথা কি বল্‌তে আছে মা? নিজেদের বাড়ী-ঘর আস্‌বেন বৈকি!

নীলা। তা আসুন না। তার-জন্যে ত কিছু বলছি না। কিন্তু তোমাকে অমন ক'রে বলবেন কেন?

শৈল। তা বল্লেনইবা। ওঁরা বড়, ওঁরা যদি কিছু বলেন, তাতে কি রাগ করতে আছে?

নীলা। বড় ব'লে যা তা বলবেন—না? আমি কিন্তু মেজ খুড়ীমাকে এবার একদিন আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

শৈল। ছি-মা! ও কথা কি বল্‌তে আছে?

নীলা। না, বল্‌তে নেই বৈকি, ওরকম—লোককে বল্লে, কিচ্ছু দোষ হয়না। দেখ্‌ছেন মার ঐ রকম অসুখ, আজ ক'মাস ধরে ভুগ্‌ছেন, আর উনি কেবল এটা ওটা লাগিয়ে মার মন ভাঙিয়ে দিচ্ছেন।

শৈল। তা দিন না। দিদির কথায় আমি কিছু মনে করি না।

ব্যস্তভাবে রমেশ প্রবেশ করিল

কি গো! ফিরে এলে যে?

রমেশ। আর বল কেন? যে ভুলো মন! নীলা, চট্‌ ক'রে একবার ওপরে যা ত মা! আমার ঘরে খাটের ওপর একটা লম্বা খাম আছে সেটা নিয়ে আয় ত—

নীলার প্রস্থান

শৈল। মা মঙ্গলচণ্ডী যদি মুখ তুলে চান, তবেই এ অপমানের হাত থেকে হয়ত আমরা রক্ষে পাব।

রমেশ। চাকরী পাই আর না পাই, আমার কী মনে হয় জান শৈল? এখন এখান থেকে দিনকতক আমাদের চলে যাওয়াই ভাল।

শৈল। তা কি হয়? দিদির অসুখ, তাঁকে ফেলে আমাদের কি যাওয়া উচিত?

রমেশ। বৌঠানকে দেখবার ত এখন লোক হয়েছে।

শৈল। কিন্তু মেজদিদির ওপর ভার দিয়ে আমি কী করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি বল?

রমেশ। না থাকতে পারলে, ছেলেদের পড়ানোর কাজটাই শেষ পর্য্যন্ত আমাকে নিতে হবে। মেজবৌ মাস কাবারে ২৫৲ টাকা মাইনে আমার হাতে দেবেন, আর আমি ঠাকুর, চাকর, সরকারের মত হাত পেতে তা নেব, আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে।

শৈল। অদৃষ্টে যদি তা থাকে, দেখতে হবে বৈকি!

রমেশ। ছোট কাজই যদি করতে হয়, আপনার লোকের কাছে করতে পারবো না শৈল!

শৈল। যত কষ্ট, যত দুঃখই হোক—আমিও তোমায় তা করতে দেব না।

রমেশ। এ চাকরীটা জোটে ভাল, নইলে তোমাদের নিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে যাব।

শৈল। তা না হয় গেলে। কিন্তু খাওয়াবে কী? চালাবে কি ক'রে?

ইতিমধ্যে নীলা খামটি আনিয়া দিল।

নীলা। এই নাও কাকা। (খামটি রমেশের হাতে দিয়া) এতে কী আছে?

রমেশ। সার্টিফিকেট্।

নীলা। ও! পাশ করলে যা দেয়?

রমেশ। হ্যাঁ। কিন্তু ক'রে খাওয়ার পক্ষে এ গুলোই যথেষ্ট নয়।

নীলা। তবে লোকে পাশ করে কেন? রোজগার করবার জন্তেই ত?

রমেশ। না, মা! রোজগারের জন্যে পাশ করা নয়—মানুষ হওয়ার জন্যে লেখাপড়া শেখা—পাশ করা। ঠিক তোমার বাবার মতন সদাশিব মানুষটী হওয়ার জন্যে পাশ করা!

নীলা। (সবিস্ময়ে) ও!

পঞ্চম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরীর শয়ন কক্ষ

সিদ্ধেশ্বরী ঘরে বসিয়া আছেন। নয়নতারা সিদ্ধেশ্বরীর সেবার কার্য্যে নিযুক্ত। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে।

নয়ন। ছেলেদের পড়ানোর কথা শুনে, ছোটবাবুর নাকি খুব রাগ হয়েছে। তেজ করে নাকি বলেছেন—ছেলেপুলের হাত ধরে গাছ-তলায় গিয়ে দাঁড়াব—তবু পঁচিশটা টাকার জন্যে মেজদার কাছে হাত পাত্‌তে পারবো না। বলি, তেজ করে ত বল্লি, কিন্তু এতদিন কার খেলি? কার পল্লি? বাপ-মা ত অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিল। বলি, দাদারা না থাক্‌লে কে তোকে মানুষ ক'রতো শুনি?

সিদ্ধে। ওসব কথা বাদ দাও মেজবৌ। দশ বছরের মেয়ে—যাকে এনে মানুষ করলুম, সংসার চেনালুম, সে আজ ক'দিন আমার সঙ্গে কথা কয় নি। বলি, আমি ত বড়, আমি যদি একটা কথা বলেই থাকি, তাই বলে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করবি?

নীলার প্রবেশ

নীলা। আমায় ডাক্‌ছিলে মা?

সিদ্ধে। হাঁ। কোথায় ছিলি এতক্ষণ শুনি?

নীলা। ছোট খুড়ীমার কাছে।

সিদ্ধে। ছোট খুড়ীমার কাছে তোর এত কী-লা! যে একদণ্ড আমার কাছে বস্‌তে পারিস্ না? বসে থাক্ পোড়ারমুখী, চুপ ক'রে এইখানে।

নয়ন। ছিঃ মা! বড় হয়েছো, দুদিন পরে শ্বশুর ঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও, বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বসবে, দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুটো ভাল কথা শিখে নেবে, এখন কি আর—যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত?

নীলা। বাড়ীর মধ্যে যার-তার সঙ্গে সারাদিন আবার কখন কাটাই মেজ খুড়ীমা? তুমি কি ছোট খুড়ীমার কথা বলছ?

নয়ন। আমি কারুর কথাই বলিনি নীলা, আমি শুধু বলছি, তোমার রোগা মায়ের সেবা যত্ন করা উচিত।

সিদ্ধে। সেবা যত্ন করবে? বরঞ্চ আমি মলেই ওরা বাঁচে।

নয়নতারা। এরা না হয় ছেলেমানুষ দিদি, জ্ঞান বুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোট বৌ ত ছেলেমানুষ নয়, তার ত বলা উচিত, যা নীলা—তোর মায়ের কাছে দু'মিনিট বস্‌গে যা, না সে নিজে একবার আস্‌বে, না মেয়েটাকে আস্‌তে দেবে?

সিদ্ধে। তোমাকে সত্যি বল্‌ছি মেজবৌ, আমার এক এক সময় এমন ইচ্ছে হয়, যে শৈলর আর মুখ দেখ্‌বো না—

নয়ন। অমন কথা বলোনা দিদি, হাজার হোক, সে সকলের ছোট, তুমি রাগ করলে, তাদের যে আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। হ্যাঁ—ভাল কথা, কথায় কথায় ভুলেই গেছি, এ মাসে উনি পাঁচশো টাকা পেয়েছিলেন তার খুচরো ক'টা টাকা নিজের হাতে রেখে, বাকী টাকাটা তোমাকে দিতে বল্‌লেন।

নয়নতারা আঁচল হইতে টাকা বাহির করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর হাতে দিলেন।
সিদ্ধেশ্বরী সবিস্ময়ে টাকা হাতে লইয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। টাকা! কিসের টাকা মেজবৌ?

নয়ন। ওই যে বল্লুম, তোমার দেওর কাল পেয়েছিলেন, তাই বল্লেন—এটা বড়বৌকে দিয়ে এসো।

সিদ্ধে। নীলা, চট্ করে যা তো মা! তোব ছোট খুড়িমাকে একবার ডেকে দেতো, এ টাকা-গুলো তুলে রাখুক।

ব্যস্তভাবে নীলার প্রস্থান

নয়ন। এখন থেকে নিজে একটু শক্ত হওয়ার চেষ্টা করো দিদি, টাকা পয়সা নিজের হাতেই রাখবার চেষ্টা কর; ও জিনিষটা এতই খারাপ যে পরকে দিয়ে বিশ্বাস নেই। আমাদের পাড়ার ঐ যদু বাবু গোপাল বাবু, হারাণ সরকার কেউতো আমাদের বড়ঠাকুরের অর্দ্ধেকও রোজগার করে না। তবুও তাদের কারুর ব্যাঙ্কে লাখ-টাকার কম জমা নেই, আর তাদের বৌয়েদের হাতেও দশ বিশ হাজার জমেছে।

সিদ্ধে। (সবিস্ময়ে) তুমি কি করে জান্‌লে মেজবৌ!

নয়ন। তোমার দেওর যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সব তোমার দেওরের বন্ধু কিনা? তাই ত কাল গোপাল বাবুর স্ত্রী আমার কথা শুনে তো বিশ্বাসই করলেন না। বললেন—এ কি আবার একটা কথা হলো মেজবৌ? তোমার ভাশুর অত টাকা রোজগার করেন, আর তোমার দিদির হাতে টাকা নেই!

সিদ্ধে। আলমারী—বাক্স—পেঁট্‌রা—সিন্দুক খুলে তুমি দেখতে পার মেজবৌ, সংসার খরচের টাকা ছাড়া—কোথাও যদি একটা বাড়তি পয়সা থাকে। যা করবে সে ত ঐ ছোটবৌ।

শৈলর প্রবেশ

শৈল। আমায় ডাক্‌ছিলে দিদি?

সিদ্ধে। হ্যাঁ দিদি, ডাকছিলুম বৈকি! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বললুম, তোর ছোট খুড়িমাকে ডেকে দে, টাকাগুলো তুলে রাখুক! এই নে—

সিদ্ধেশ্বরী বালিশ বিছানার তলা হইতে অনেকগুলি মোট খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলেন। পরে সেই টাকার সহিত নয়নতারার দেওয়া টাকা শৈলজাকে দিলেন। শৈলজা আলমারী খুলিয়া টাকা রাখিল। নয়নতারা লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল।

নয়ন। কাল তোমার দেওর বল্‌ছিলেন যে,জেঠ্‌তুতো খুড়্‌তুতো ভাই তো নয়—মায়ের পেটের ভাই,তার খাবনা পরবো না তো যাবো কোথায়? তবু মাসে মাসে যদি এমনি করে অন্ততঃ চারশো পাঁচশো টাকাও দাদাকে সাহায্য করতে পারি; তো অনেক উপকার। তাই তো উনি বল্‌ছিলেন—বৌঠান্ মুখ ফুটে যেন কারুর কাছে কিছু চান না, তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না? যার যেমন শক্তি, কাজ ক'রে তাঁকে সাহায্য করা উচিত। নইলে বসে বসে গুষ্টিশুদ্ধু কেবল খাব আর ঘুমোব, তা করলে কী চলে? তোমারও তো দিদি, হরি মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই। সর্ব্বস্ব এমনি করে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে ত চলবে না। সত্যি করে বল দিদি, ঠিক কী না!

সিদ্ধে। তা সত্যি বৈ কি।

শৈলজা ইতিমধ্যে আঁচল হইতে চাবির রিংটী খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া কোনরকমে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। এটা কী হলো ছোট বৌ?

শৈলজা ফিরিয়া কহিল।

শৈল। পরের টাকার হিসেব রাখার মত বিদ্যে বুদ্ধি আমার নেই দিদি, তাই কদিন ধরেই ভেবে দেখছিলুম, এ চাবি আর আমার কাছে রাখা ঠিক হবে না। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে। মতিভ্রম হতে কতক্ষণ? কী বল মেজদি?

নয়ন। আমি তো তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবৌ! আমাকে আর মিছে জড়াও কেন?

সিদ্ধে। মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন? শুনতে পাই কী?

শৈল। একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তারও তো কোন মানে নেই দিদি। এমনিই তো তোমাদের শুধু খাচ্ছি পরছি—না পারি, গতর দিয়ে সাহায্য করতে—না পারি, পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কী চিরকাল করা ভালো?

সিদ্ধে। এতো ভাল কবে থেকে হলি লা? এতো ভাল মন্দের বিচার— এদ্দিন তোর ছিল কোথায়?

শৈল। কেন শুধু শুধু কথা বাড়িয়ে শরীর খারাপ করছ দিদি। তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগছে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগছে না।

নয়ন। দিদির না হয় ভাল না লাগতে পারে কিন্তু তোমার ভাল লাগ ছে না কেন ছোটবৌ?

শৈলজা জবাব না দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। বলে যা পোড়ারমুখী, কবে বিদেয় হবি? আমি হরির লুট দেবো। আমার সোনার সংসার—ঝগড়া বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিলি? মেজবৌ কী সাধে বলে যে কোমরের জোর না

থাকলে মানুষের এত জোর হয় না? কত টাকা—ওরে! কত টাকা তুই আমার চুরি করেছিস্—তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈলজা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়া বলিল।

শৈল। হিসেব দিতে বলো না দিদি—হিসেব দিতে বলো না—আমার সব হিসেব ভুল, আমার সব হিসেব ভুল!

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন।

সিদ্ধে। হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবৌ, সে আমাকে এমনি অপমান করে চলে গেল! কর্ত্তারা বাড়ী আসুন, ওকে যদি আজ আমি উঠোনের মধ্যে জ্যান্ত না পুঁতি—তবে আমার নাম সিদ্ধেশ্বরীই নয়—

ষষ্ঠ দৃশ্য

গিরীশের বসিবার ঘর

তখন রাত্রি ৯টা। গিরীশ মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র মনোনিবেশ সহকারে পড়িতেছিলেন, এমন সময় হরলাল প্রবেশ করিল।

হরলাল। বাবু, শুনেছেন?

গিরীশ। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। কাজের সময় বিরক্ত করিস্ নি। বড়মার কাছে যা—

হরলাল। আজ্ঞে বড়মার কাছে গিয়ে ত কিছু হবে না, আপনি যদি—

গিরীশ। তা আমি কি করব? আমার দ্বারায়ও কিছু হবে না। আমি ও সংসারের ব্যাপারে নেই—

হরলাল। কিন্তু আপনি একটু নজর না দিলে যে সংসারটা ভেঙে যায় বাবু—

গিরীশ। ছোট বৌমাকে বল্‌গে যা, তিনি সব জোড়া লাগিয়ে দেবেন।

হরলাল। আজ্ঞে ছোট বৌমাকে ত অনেক করে বল্‌লাম, তিনি কিছুতেই যে রাজী হচ্ছেন না।

গিরীশ। তা' হলে আমি আর কী করব?

হরলাল। আপনি যদি অনুমতি করেন, তা' হলে না হয়, আমিই ওঁদের সঙ্গে যাই।

গিরীশ। (বিরক্তভাবে) যাবে না ত কী? আল্‌বৎ যাবে। দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে আমি কাজ করছি।

হরলাল দুঃখিত মনে চলিয়া গেল। গিরীশ পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন। অপর দিক দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল।

রমেশ। দাদা!

গিরীশ। কে?—রমেশ! কী খবর—

রমেশ। আপনার কাছে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

গিরীশ। (কাজ করিতে করিতে) বলো।

রমেশ। আমি ভাবছিলাম কি, যে আমি না হয় দিনকতক দেশের বাড়ীতে গিয়েই থাকি।

গিরীশ। কেন? ম্যালেরিয়া জ্বর আর পেট জোড়া পিলে আন্‌বার জন্যে?

রমেশ। দেশে ত অনেকেই রয়েছে দাদা, সাবধানে থাকলে ম্যালেরিয়া হবে কেন?

গিরীশ। না হ'লে থাক্‌তে পার।

রমেশ। বাড়ীতে না থাকলে এরপর ঘর-দোরগুলো পড়ে যেতে পারে, আর জমিজায়গাগুলোও নয়ছয় হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আমারও ত এখানে এখন কোন কাজ নেই, তাই ভাবছিলাম—

গিরীশ। তা বেশ তো, মণিরও কলেজ এখন বন্ধ রয়েছে, সে যদি যেতে চায়, ত তাকেও নিয়ে যেতে পার।

রমেশ। আচ্ছা দাদা। (রমেশ চলিয়া যাইতেছিল)

গিরীশ। আর দেখ, হরলালকেও সঙ্গে নাও। কখন কী দরকার হয় তা বলা যায় না ত।

রমেশ। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

গিরীশ পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

সিদ্ধেশ্বরী প্রবেশ করিলেন

সিদ্ধেশ্বরী। ওগো শুনছ ?—

গিরীশ নিরুত্তর।

বলি শুনতে পাচ্ছ ?

গিরীশ। দাঁড়াও, দাঁড়াও জরুরী কাজটা আগে সেরে নিই।

সিদ্ধেশ্বরী। তোমার কাজকর্ম্ম করে লাভটা কী—আমায় বলতে পার ? কেবল শুয়োরের পালগুলোকে খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্র খেটে মরবে ?

গিরীশ। (কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া) না, আর দেরী নেই—এইটুকু দেখে নিয়েই—চল খেতে যাচ্ছি।

সিদ্ধেশ্বরী। খাওয়ার কথা কে তোমাকে বলছে ? আমি বলছি ছোট বৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার

মতলব করেছে। এতদিন যে তাদের এত করলে, একদিনেই কি সব মিছে হয়ে গেল! সে খবর শুনেছো কি?

গিরীশ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি। ছোট বৌমাকে বেশ ভাল করে গুছিয়ে নিতে বল। কখন কি দরকার হয় বলা যায় না! হরলালকেও ওদের সঙ্গে দাও। আর মণি যদি যেতে চায়—

সিদ্ধেশ্বরী। বলি, আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুল্‌তে নেই? আমি কি বল্‌ছি আর তুমি কি জবাব দিচ্ছ? ছোট বৌরা যে বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে।

গিরীশ। কোথায় যাচ্ছেন?

সিদ্ধেশ্বরী। কোথায় যাচ্ছেন, তার আমি কি জানি?

গিরীশ। ও-হো! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে—দেশের বাড়ীতে।

সিদ্ধেশ্বরী। তা ত যাচ্ছেন। কিন্তু তুমি তোমার ভবিষ্যতটা ভেবে দেখেছ কি?

গিরীশ। বর্ত্তমান নিয়ে এখন এত ব্যস্ত! যে ভবিষ্যৎ ভাব্‌বার সময় নেই।

সিদ্ধেশ্বরী। তা বুঝেছি, নইলে আমার পোড়াকপাল এমন করে পুড়্‌বে কেন?

গিরীশ। বলি তেত্রিশ বছর ঘর করে আজ এটা হঠাৎ আবিষ্কার কর্‌লে না কি?

সিদ্ধেশ্বরী। নয়ত কি! আজ যদি তুমি চক্ষু বোঁজ, আমি না হয় কারুর বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে খাব। আর সে আমাকে কর্ত্তেই হবে, সে আমি বেশ জানি। কিন্তু আমার মণি হরি যে কোথায় দাঁড়াবে তার—

গিরীশ। হরে! হরে কোথায় গেলিরে?

সিদ্ধেশ্বরী। হরিকে আবার শুধু শুধু ডাক্‌ছ কেন?

গিরীশ। শুধু শুধু ডাক্‌ছি! এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

সিদ্ধেশ্বরী। কি ব্যবস্থা করবে শুনি?

গিরীশ। যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়।

ইতিমধ্যে হরিচরণ প্রবেশ করিল

হরিচরণ। আমায় ডাক্‌ছিলেন বাবা?

গিরীশ। হ্যাঁ, ডাক্‌ছিলুম। হারামজাদা, পাজী, ফের্ যদি তুই ঝগড়া করবি—ত ঘোড়ার চাবুক তোর পিঠে ভাঙ্‌ব। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা—খেলা—খেলা—আর ঝগড়া—ঝগড়া—ঝগড়া? মণি কই?

হরিচরণ। (সভয়ে) জানি না।

গিরীশ। জানিস্ না? মনে করেছিস্ তোদের বজ্জাতি আমি টের পাই নে? আমার সব দিকে নজর আছে তা জানিস্? কে তোদের পড়ায় ডাক্ তাকে—

হরিচরণ। আমাদের থার্ড মাষ্টার ধীরেন বাবু ত সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ। সকালে কেন? রাত্রে পড়ায় না কেন, শুনি? আমি চাইনে এমন মাষ্টার। যা মন দিয়ে পড়্‌গে যা—হারামজাদা বজ্জাত!

হরিচরণ কাঁদ কাঁদ হইয়া চলিয়া গেল—গিরীশ সিদ্ধেশ্বরীকে বলিলেন।

দেখ্‌ছ আজকালকার মাষ্টারগুলোর স্বভাব! কেবল টাকা নেবে—আর ফাঁকি দেবে। ভাল ক'রে পড়াবে না। শুদ্ধু ফাঁকি দেবার মতলব। রমেশকে বলে দিও—কালই যেন, ও মাষ্টারকে জবাব দিয়ে, পরাণ মাষ্টারকে রেখে দেয়। মনে করেছে আমার চোখে ধূলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে?

সিদ্ধেশ্বরী। ধূলো আর দেবে কি? ধূলোয় ত তোমার দু'টী চক্ষু বুঁজে আছে।

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

গিরীশের বাটীর অন্দরমহল

শৈলজার ঘরের সামনে বাক্স, বিছানা ও সাংসারিক অন্যান্য জিনিসপত্র এবং একটি হ্যারিকেন পড়িয়া আছে। শৈলজা একখানি চওড়া লাল পাড় সাড়ি ও গায়ে তদুপযুক্ত জামা পরিয়া, কানাই ও পটলকে সেইরূপ ফরসা জামা কাপড় পরাইয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন—নীলা সজলনেত্রে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। রমেশ গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল, হরলাল তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষ আনিবার জন্য গিয়াছে। নীলা আব্দারের সুরে শৈলজাকে বলিল।

নীলা। আমিও তোমার সঙ্গে যাব ছোট খুড়িমা?

শৈল। আজ আর আমার সঙ্গে যায় না মা, এর পরে যেও—

নীলা। না। আমি আজই যাবো? তাহলে তুমি কানাই আর পটলকে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

শৈল। ওরা কী আমায় ছেড়ে থাকতে পারে?

নীলা। না, পারে না বৈ কি! সেবার তুমি যখন তোমার মাসীমার বাড়ী পটলডাঙ্গায় গেলে; কানাই, পটল তো তখন মার কাছেই ছিল।

কানাই। সেই ভালো মা, দিদি তোমার সঙ্গে যাক্—আমি বরং থাকি।

শৈল। তা হয় না কানাই। তোমাকে পটলকে সঙ্গে না নিয়ে, আমি যাবো না। তোমরা আজকাল বড্ড দুষ্টু হয়েছো।

কানাই। কিচ্ছু দুষ্টুমী করবো না মা। তুমি বরং এসে বড়মাকে জিজ্ঞেস্ করো—।

নীলা। সেই ভালো! কানাই থাক—আমি যাই। তুমি চলে যেওনা ছোট খুড়িমা, আমি চট্ করে জামা কাপড়টা বদলে এক্ষুনি আস্‌ছি।

নীলার দ্রুত প্রস্থান

কানাই। তাহলে আমি থাকি মা!

শৈল। না, তোমাকে থাকতে হবে না। দিদির শরীর খারাপ তুমি তাঁকে বড্ড জ্বালাতন কর, তোমাকে আমি কিছুতেই রেখে যাব না। চল, দিদিকে প্রণাম করে আসি।

শৈলজা কানাই ও পটলকে লইয়া দু একপদ অগ্রসর হইতেই—
হরলাল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শৈল। গাড়ী এসেছে হরলাল?

হর। হ্যাঁ ছোট মা—! ছোটবাবু গাড়ীও নিয়ে এসেছেন, বাইরে অপেক্ষা করছেন।

শৈল। তুমি ততক্ষণ মোটঘাটগুলো গাড়ীতে তুলে দাও। আর ছোট বাবুকে বলো, দিদিকে এসে প্রণাম করে যেতে।

হর। আচ্ছা মা।

শৈলজা কানাই ও পটলকে লইয়া প্রস্থান করিল।

হরলাল মোট লইয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময়
সিদ্ধেশ্বরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সিদ্ধে। ছোট বৌ কি সত্যিই চলে যাচ্ছে হরলাল?

হর। হ্যাঁ মা, ছোটবাবু গাড়ীও ডেকে এনেছেন।

সিদ্ধে। আচ্ছা, তুইই বল্ হরলাল, কী এমন অন্যায় কথাটা আমি বলে-

ছিলাম, মেজবৌ, না হয় অবুঝ, কিন্তু তুই তো অবুঝ নোস্। তোকে ত আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছি। তোর উপর বিশ্বাস করে আমি যে সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়েছি, সে কেন? তোর উপর জোর আছে বলেই না?

হর। সে তো ঠিক কথা।

সিদ্ধে। কিন্তু তুই সেই কথাটাকে ধরে বসে থাকলি! আমার মনের কথাটা বুঝতে পারলি না? যাক্, আমি কিছু বলতে চাই না, ধর্ম্ম আছেন, ভগবান আছেন, তিনি এর বিচার করবেন।

হর। ছোট বাবুকে তাই তো বল্‌ছিলাম বড়মা! যে সংসারে থাক্‌তে গেলে, এ রকম তো হয়েই থাকে। তা আমার কথা তো আর শুনলেন না।

সিদ্ধে। তুই বুঝ্‌মান, তোকে আর কি বলব বাবা, সঙ্গে যখন যাচ্ছিস্, দেখিস্—ওদের যাতে কোন অসুবিধা বা কষ্ট না হয়।

হর। সে আর বল্‌তে! দেখবার জন্যেই তো যাচ্ছি বড় মা।

সিদ্ধে। পটলাটা সন্ধ্যেবেলা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে; তুলে না খাওয়ালে —খাওয়াই হয় না। আবার কানাইটা আধ-পেটা খেয়ে উঠে পড়ে!

হর। ওর জন্য তুমি কিচ্ছু ভেবনা বড় মা, আমি সব দেখবো। যাই—গাড়ী এসে গিয়েছে—মোটঘাটগুলো তুলে দিই গে—

সিদ্ধে। ছোটবৌ বুঝি ছেলে দুটোকে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে?

হর। না, তিনি তো আপনাকে পেন্নাম করতে এই দিকেই গেলেন—

হরলাল মোট তুলিবার উদ্যোগ করিল। সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন।

সিদ্ধে। আর পেন্নামে কাজ নেই। সকলের বড় হয়ে, আজ আমি সকলের ছোট হয়ে আছি।

হরলাল ইতিমধ্যে মোট লইয়া চলিয়া গেল। অপর দিক হইতে পটল ও কানাইকে

লইয়া শৈলজা প্রবেশ করিল। গলায় আঁচল দিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিল। ইহার মাঝে রমেশও আসিয়া উপস্থিত হইল। রমেশ প্রণাম করিল। শৈলজা কানাই ও পটলকে বলিলেন।

শৈল। বড় মাকে প্রণাম করো—

সিদ্ধে। ওদের প্রণামের অপেক্ষা আমি করবো না! ওদের ওপর আমার যে আশীর্ব্বাদ আছে—তা চিরদিন থাকবে। (কাঁদিয়া) ওরা বড় হোক—মানুষ হোক—সুখী হোক, কিন্তু এইটাই কি উচিত হলো ছোটবৌ? মার কাছ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া? আমি কিছু বলতে চাই না, যিনি দিনরাত করছেন, তিনি এর বিচার করবেন।

কানাই পটলকে লইয়া রমেশ ও শৈলজা প্রস্থান করিল।
সিদ্ধেশ্বরী উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

সিদ্ধে। কী এমন আমি বলেছিলুম, যার জন্যে এম্‌নি করে চলে যেতে হবে? বড় হয়ে আমি না হয় পায়েই ধরিনি, ঘাট মানিনি, তাই বলে, ভুল যা করেছি—তা কি আমি স্বীকার করিনি, আমাকে না হয় বল্লেই হতো, দিদি এটা তোমার অন্যায় হয়েছে। আমি মেনে নিতুম। তাই বলে, ওই মা-মরা দু'মাসের ছেলেটাকে, যাকে আমি বুকের কাছে রেখে দেড় বছরের করেছিলুম—তাকে এমনি করে নিয়ে যাওয়া? তখন তুই ছিলি কোথায়? আমিই তো তাকে মানুষ করেছিলুম।

ইতিমধ্যে নয়নতারা প্রবেশ করিয়াও সমস্ত ব্যাপারটি দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করিল।

অপর দিক দিয়া নীলা ভাল জামাকাপড় পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল।

নীলা। ছোট খুড়িমা কোথায় গেলেন মা ?

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। তারা চলে গেছে !

নীলা। (কাঁদিয়া) এ্যাঁ ! ছোট খুড়িমা চলে গেলেন—পটল, কানাই ?

সিদ্ধে। (নীলাকে বুকের কাছে টানিয়া) তারা সবাই চলে গেল মা ! সবাই চলে গেল !

নীলা। আমি যে ছোট খুড়িমার সঙ্গে যাবো বলে ছুটে এলাম মা !

সিদ্ধে। (কাঁদিয়া) সে পাষাণী ! তাই নিয়েও গেল না ! থেকেও গেল না !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরীর শয়ন কক্ষ।

তখন রাত্রি ১১টা-১২টা। সিদ্ধেশ্বরী শয্যার উপর বালিশে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে আজ অধিকতর ক্লান্ত, চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। খাটের অদূরে একটি ইজি-চেয়ারে বসিয়া গিরীশ মনোযোগ সহকারে গ্রীক্ পাঠ করিতেছিলেন। পার্শ্বে একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল।

সিদ্ধে। কানাই-এর শোওয়া খারাপ, তাকে নিয়ে ওরা মেঝেয় শোয় কি খাটে শোয় কে জানে? খাটে শোয়ালে, নিশ্চয়ই একদিন পড়ে গিয়ে হাত পা ভাঙ্‌বে!

গিরীশ। (সহসা চম্‌কাইয়া) এ্যাঁ! কার পা ভাঙ্‌ল?

সিদ্ধে। ভাঙেনি; কিন্তু খাট থেকে পড়ে গিয়ে ভাঙ্‌তে কতক্ষণ?

গিরীশ। সরে বস।

সিদ্ধে। আমি সরে বসতে গেলাম কেন? কানাই-এর শোওয়া খারাপ তাই বলছি!

গিরীশ। ও!

সিদ্ধে। পটলাটার রাত্রি বেলায় ক্ষিদে পায়, ঘুম থেকে উঠে দুটো রসমুণ্ডি না খেলে তার ঘুম হয় না। মা-র যা হুঁস, তাকে উঠে খাওয়াবে কিনা কে জানে? ছেলেটা হয় ত ক্ষিদেয় এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করছে—বল, ঠিক বলেছি কিনা?

গিরীশ। (অন্যমনস্ক হইয়া) তা হতে পারে।

সিদ্ধে। হতে পারে নয়, এ হয়ে বসে আছে—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

গিরীশ। তা হবে।

সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু ওদের ভরসায়, এইভাবে কি ছেলে ছ'টোকে ওখানে ফেলে রাখা উচিত?

গিরীশ। কখনো নয়।

সিদ্ধেশ্বরী। (অভিমানে) নয় ত মান্‌লুম। কিন্তু তার ব্যবস্থা কী করছ?

গিরীশ। যা হোক একটা কিছু কর্ত্তে হবে।

সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সে কবে?—আচ্ছা পটলকে শৈল না হয় নিয়ে গেল, কিন্তু কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়—সতীন পো। তার ওপর শৈলর জোর কী?

গিরীশ। কিচ্ছু না।

সিদ্ধেশ্বরী। তা'হলে আমরা ত তার নামে নালিশ করতে পারি।

গিরীশ। পারি বৈ কি!

সিদ্ধেশ্বরী। নালিশ করলে নিশ্চয়ই তার সাজা হবে?

গিরীশ। হুঁ। হবে।

সিদ্ধে। আচ্ছা সে যেন হলো, কিন্তু পটল ওর পেটের ছেলে হলে কী হয়? আমিই তো তাকে মানুষ করেছি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, যে সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। তাছাড়া আমার কথা ভেবে ভেবে তার শক্ত অসুখ হতে পারে। তা'হলে হাকিম কী রায় দেবে না—যে সে তার জ্যেঠাইমার কাছে থাকুক।

সিদ্ধেশ্বরী গিরীশের উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সাড়া না পাওয়ায় বিরক্তভাবে কহিলেন।

কী বল্‌ছি শুনতে পাচ্ছ? না, না?

গিরীশ। হ্যাঁ!

সিদ্ধে। বল্‌ছি হাকিম কী রায় দেবে না?

গিরীশ। নিশ্চয়ই না।

সিদ্ধে। কেন নয়? মা বলেই যে সে ছেলেকে মেরে ফেলবে, এমন তো কোন হুকুম নেই—মেজঠাকুরপোকে দিয়ে কাল যদি উকিলের চিঠি দেই—কী হয় তা হলে?

গিরীশ। খুব ভাল হয়, কিন্তু কথায় কথায় যে অনেক রাত হয়ে গেল! শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। আমি বরং কাগজপত্রগুলো নিয়ে ওঘরে পড়ি গে যাই।

সিদ্ধেশ্বরী শয়ন করিতে করিতে বলিলেন।

সিদ্ধে। কাল যদি আমি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকিলের চিঠি না দেওয়াই—তবে আমার নাম সিদ্ধেশ্বরীই নয়।

গিরীশ। এখন সিদ্ধিদাতা গণেশ তোমার চোখে ঘুম দিলেই বাঁচি।

গিরীশ ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দরজার কাছে সুইচ্‌টি অফ্‌ করিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মঞ্চটী সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মঞ্চটী আলোকিত হইল। দেখা গেল—সকাল হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী ক্লান্ত ও চিন্তিত মনে একাকী খাটের ওপর বসিয়া আছেন। হরিশ ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল।

হরিশ। কী ব্যাপার বৌঠান? সকালবেলাতেই তলব?

সিদ্ধে। একটা জরুরী বিষয়ে পরামর্শের জন্যে—। বস, মেজঠাকুরপো।

হরিশ একটা চেয়ারে বসিল।

সিদ্ধে। দেখ, দেরী করলে চলবে না। এক্ষুণি ছোট্‌ঠাকুরপোদের নামে একটা উকিলের চিঠি লিখে দরোয়ানকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। আর

চিঠির মধ্যে বেশ কড়া করে জানিয়ে দাও যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এর জবাব না পেলে নালিশ করবো।

হরিশ। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলতো বৌঠান? কি কি জিনিস নিয়ে সরে পড়লো? গয়নাগাঁটি কিছু নিয়ে পালায় নি তো?

সিদ্ধে। না।

হরিশ। নগদ টাকা?

সিদ্ধে। তাও না।

হরিশ। বাসনকোসন? দাবীটা একটু বেশী করে দেওয়া চাই—বুঝলে না?

সিদ্ধে। তা দাবীটা একটু বেশী ঠাকুরপো, তবে ওসব কিছু নয়। আমি কানাই আর পটলাকে ওদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাই। কেন না, কানাই ছোটবৌয়ের পেটের ছেলে নয়। আর পটলাকে মানুষ করেছি আমি। কাজেই আমার অমতে ছোটবৌ তাদের নিয়ে যেতে পারে না, এই আমার দাবী—এই আমার নালিশ।

হরিশ। তুমি ক্ষেপেছ বৌঠান? আমি বলি বা আর কিছু, আরে তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তা তুমি করবে কী?

সিদ্ধে। তা তোমার দাদা যে বল্লেন—নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে?

হরিশ। দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে তামাসা করছেন—

সিদ্ধে। এতটা বয়েস হলো তামাসা কাকে বলে বুঝি না ঠাকুরপো! তোমার মনোগত ইচ্ছা নয় যে, ছেলে দু'টোকে আমার কাছে আনি—তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?

হরিশ। তুমি ভুল বুঝছ বৌঠান! এই নিয়ে নালিশ চলে না।

সিদ্ধে। বেশ, তুমি না পার, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেন উকিলের কাছ থেকে লিখিয়ে আন্‌ছি।

হরিশ। কোন উকিলই এই ব্যাপার নিয়ে চিঠি দেবে না বৌঠান। তবে তাকে যদি জব্দ করতে চাও—তাহলে অন্য কোন দাবী দাওয়া উত্থাপন করে বা বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে তাকে জব্দ করা যেতে পারে। আর আমাদের উচিতও এখন তাই করা।

সিদ্ধে। তোমার উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো! আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—এখন আমি মিথ্যে দাবী-দাওয়া উত্থাপন করতে পারবো না।—

হরিশ। তবে আমি আর কী করব?

হরিশ প্রস্থান করিল। সিদ্ধেশ্বরী সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন।
অপর দিক হইতে সরকার গণেশ চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন।

গণেশ। মা!

সিদ্ধে। কে? ও গণেশ!

গণেশ। হ্যাঁ মা, এই হিসেবটা—

সিদ্ধে। দেখ গণেশ, তোমার কী হিসেব দেবার একটা সময় অসময় নেই?—

গণেশ। কী করি মা! আপনাদের টাকা নিয়ে নাড়া-চাড়া করি; গরীব মানুষ, পাছে টাকা পয়সার গণ্ডগোল হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি হিসেব-নিকেশ বুঝিয়ে দিয়ে খালাস হতে চাই—

সিদ্ধে। কিন্তু আমারও ত একটা সময়-অসময় আছে গণেশ। দাও কী হিসেব দেবে, দাও—

গণেশ। আপনি আমায় খরচের জন্যে যা দিয়েছিলেন—তার মধ্যে মণিহারী দোকানে বাকী ছিল বারো টাকা, মেজমার ছেলেমেয়েদের

স্কুলের মাইনে বাবদ দিয়েছি তিরিশ টাকা, আর খুচরা খরচ হয়েছে আট টাকা। বাজারে দেনা আছে দু'টাকা।

সিদ্ধে। বারো গণ্ডা টাকা আমি তোমায় দিলাম, তাতেও আবার দেনা রেখে এলে গণেশ ?

গণেশ। আজ্ঞে মেজমার ক'টা খুচরো জিনিষ কিন্‌তে দুটাকা দেনা-হয়ে গেল।

সিদ্ধে। তাহলে মোট খরচ হলো কত তাই শুনি -

গণেশ। আজ্ঞে পঞ্চাশ টাকা।

সিদ্ধে। দেখ গণেশ, আমি লেখা-পড়া জানিনে বলেই যে তুমি আমাকে বোকা বুঝিয়ে যাবে—তা মনে করো না। বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশী খরচা হয়েছে বলে পঞ্চাশটা টাকা সবই খরচ হয়ে গেছে' আর কিছু নেই।

গণেশ। সত্যি আর কিচ্ছু নেই—বরং দুটাকা ধার হয়েছে।

সিদ্ধে। তা হলে তুমি বল্‌তে চাও—এই বারো গণ্ডা টাকার উপর আরো দু'টাকা ধার হয়েছে।

গণেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশ্বাস না হয় দিদিমণিকে ডেকে হিসেবটা—

সিদ্ধে। নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে? সে কি আমার চেয়ে বেশী বুঝবে ? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করে হিসেব দেবে, তা হবে না। সে যদি আজ থাকতো—তাহলে, কি আজ আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হতো—পোড়ারমুখীকে দশ বছরের বৌ করে ঘরে আনলুম, বুকে করে মানুষ করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ীর দু দুটো ছেলেকে নিয়ে চলে গেল। তা যাক, আমিও খবর রাখছি; কানাই পটলের যদি কোনদিন এতটুকু অসুখ হয়েছে শুনতে পাই—তাহলে দেখব

সেদিন, কেমন করে সে ছেলে দুটোকে আট্‌কে রাখে? তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন গণেশ? এখন যাও। দুপুর বেলা মনে করে বলে যেও—এত গুলোটাকা কি করলে।

গণেশ। আচ্ছা মা।

গণেশের প্রস্থান

অপর দিক দিয়া নয়নতারার প্রবেশ

নয়ন। গণেশকে কী বল্‌ছিলে দিদি?

সিদ্ধে। এই হিসেব-পত্তর; যে ঝঞ্ঝাট আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।

নয়ন। তা বেশ তো, তুমিই বা এত ঝঞ্ঝাট সহ্য করবে কেন? ছোটবৌ না হয় নেই কিন্তু আমি তো রয়েছি। তুমি যদি বলো তাহলে আমিই না হয় কাল থেকে হিসেব পত্তর দেখবো। আমার কাছে কারুর চালাকী করে ভুল হিসাব দেবার উপায় নেই।—

সিদ্ধে। তা বেশ তো, কাল থেকে তুমিই হিসেব রেখো মেজবৌ! আমার এই অসুখ শরীরে এত হাঙ্গামা ভাল লাগে না। শৈল ছিল, যেখানকার যত টাকা—তার হিসেব রাখা, খরচ করা, এ সমস্ত সেই করত। এ সমস্ত কী আমার দ্বারা হয়? বেশ তো এখন থেকে না হয়—তুমিই এ সব করো মেজবৌ।

সিদ্ধেশ্বরীর আঁচলের চাবিটী হাতে ছিল, নয়নতারা হাত বাড়াইলেন, ভাবিলেন, তিনি বোধহয় চাবিটি তাহাকে দিবেন কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী চাবিটী তো তাহাকে দিলেনই না উপরন্তু চাবিটী আঁচলে আরো শক্ত করিয়া বাঁধিয়া কাঁধের উপর ফেলিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ছোট বিষ্ণুপুর গ্রাম। রমেশদের পৈতৃক বাড়ী

অন্দরমহল, উঠানের মাঝখানে পাতকুয়া, দুই দিকে ঘরের সংলগ্ন খোলা দালান। বাড়ীটীর চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তখন অপরাহ্ণ। উঠানের মাঝে একটী প্রৌঢ় লোক প্রবেশ করিল—তাহার নাম বেহারী। তাহার সাজসজ্জা অদ্ভুত রকমের, গায়ে বহুবিধ রঙের একটী বেনিয়ান, পরণে গৈরিকবাস, হাতে ও গলায় কড়ির মালা, গলায় ছোট্ট একটী চামর ঝুলিতেছে, পায়ে ঝাঁঝর, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা—তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ গোঁজা, সহসা নৃত্যের ভঙ্গিতে উঠানের মাঝে প্রবেশ করিয়া আপন মনেই বলিল।

বেহারী। রোগ বালাই দূরে যাক্।
কর্ত্তা গিন্নী সুখে থাক্॥
সংসারের হোক বার-বাড়ন্ত।
আমি যেন হই পয়মন্ত॥

এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে হরলাল প্রবেশ করিয়া বলিল।

হর। ওহে পয়মন্ত! আস্তে আস্তে সরে পড় দেখি—

বেহারী। আমি এলে তুমি ওরকম কর কেন বল দেখি?

হর। সময় নেই, অসময় নেই, তুমিই বা ওরকম ঘুমুর বাজিয়ে আস কেন বল দেখি?

বেহারী। বেশ করি আসি। মাঠাকরুণ দাদাবাবুরা ভালবাসেন তাই আসি।

হর। তা অন্য দিন এস্যো, আজ এখন যাও। ছেলে দুটো জ্বরে কোঁ কোঁ করছে, মা তাদের কাছে বসে আছেন, আজ আর দেখা হবে না।

বেহারী। তোমার কথায় দেখা হবে না? বলি, তুমি কি বাড়ীর কর্ত্তা নাকি?

হর। আঃ মর! আবার চোপা করে? বেরো বোরো—বল্‌ছি।

বেহারী। খবরদার! অমন কথা বলবে না বলে দিচ্ছি, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক আমাকে বলে পয়মন্ত, আমার কল্যাণে হয় লোকের বাড়-বাড়ন্ত! আর আমাকে বলে কিনা বেরো—

হর। বেশ করি বলি—কেন তুই সময় নেই অসময় নেই আসিস্?

বেহারী। বেশ করবো—আসবো।

ঝগড়া শুনিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া শৈলজা কহিলেন।

শৈল। কার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছ হরলাল?

বেহারী পায়ের ওপর পা দিয়া কৃষ্ণের অনুরূপ ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া কহিল।

বেহারী। মা গো! তোমার এই পয়মন্ত ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করছে মা!

হর। পয়মন্ত তো কতো! ছেলে দুটো রোগে ভুগ্‌ছে, ভিটে-মাটি নিয়ে মাম্‌লা চলছে, বাবুর আমার শরীরের দিকে চাওয়া যায় না—

শৈল। আঃ! হরলাল! তার জন্য ও কি করবে? অদৃষ্ট ছাড়া কি মানুষের পথ আছে?

বেহারী। তবেই বলনা মা!

শৈল। তুমি কাল এসো বেহারী। ছেলে দুটোর আজ আবার খুব জ্বর এসেছে। কাল বরং তোমার ঘোড়া নিয়ে এসো—ওরা গান শুনবে।

বেহারী। সেই ভালো। ঘোড়া আমি বাইরে বেঁধে রেখে দাদাবাবু-দের খবরটা নিতে এলাম। দাদাবাবুরা আমার গান শুনতে বড্ড

ভালবাসে কিনা? আচ্ছা, তাহলে আজ আমি আসি মা। কাল আবার আসবো।

বেহারী নৃত্যের ভঙ্গিমায় চলিয়া যাইতেছিল, তার ঘুমুরের আওয়াজে কানাই ও পটল মুড়িসুড়ি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া বেহারী সানন্দে ফিরিয়া কহিল।

বেহারী। এসো এসো, দাদাবাবুরা এসো। বড্ড জ্বর হয়েছে শুনছি? এসো—তোমাদের মাথায় ঠাকুরের চামর বুলিয়ে দিই—সব রোগ বালাই ভাল হয়ে যাবে।

গলায় বাঁধা চামরটি কানাই ও পটলের মাথায় বুলাইয়া দিয়া আগেকারের ছড়াটি পুনরায় আবৃত্তি করিল।

রোগ বালাই দূরে যাক্।
কর্ত্তা গিন্নী সুখে থাক্॥
সংসারের হোক বার-বাড়ন্ত।
আমি যেন হই পয়মন্ত॥

পটল। আজ তোমার ঘোড়া আননি বেহারী?
বেহারী। হ্যাঁ, এনেছি বৈ কি। বাইরে বেঁধে রেখেছি—ঘাস খাচ্ছে।
কানাই। তা তোমার ঘোড়াটাকে আনো না? একটু গান শুনি।
বেহারী। (সানন্দে) শুনবে? তা আনি।

বেহারী নৃত্যের ভঙ্গিমায় চলিয়া গেল।

হরলাল সক্রোধে কহিল।

হর। ঐ জন্যই ত ওটাকে তাড়াতে চাইছিলাম। ওকে দেখলে দাদাবাবুরা ছাড়তে চায় না। একে সব জ্বরে কাঁপছে। তার ওপর বসে বসে গান শুনলে—জ্বর আরো বেড়ে যাবে না?

শৈল। গান শুনলে কি আর এমন হবে হরলাল? ওতে তবু ওদের মনটা ভুলে থাকবে। সেখানে একবাড়ী ছেলেমেয়ের মধ্যে ওরা থাকতো, আর এখানে এসে সঙ্গী না পেয়ে, মনমরা হয়ে থেকেই আরও ওদের রোগ সারছে না।

হর। সবই বুঝি মা। কিন্তু সংসারের অবস্থা দেখে, ভয় হয়। একে মেজবাবু মামলা মোকদ্দমা করলো, তাই নিয়ে ছোটবাবুকে কোর্ট ঘর করতে হচ্ছে। তার ওপর আবার এই ছেলেদের অসুখ, রোগের ওষুধপত্তি, মামলার খরচ, কোথা থেকে যে কি হবে আমি শুধু তাই ভাবছি।

শৈল। ভেবে লাভ নেই হরলাল।

ইতিমধ্যে বেহারী ঘোড়ায় চড়িয়া আসিল। ঘোড়া অর্থাৎ ঘোড়ার অনুরূপ বৃহৎ পুতুল কোমরের সঙ্গে বাঁধিয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিল।

বেহারীর গান

ত্রেতা যুগে যজ্ঞ ঘোড়া ধরেছিল লব
(ওগো) রামচন্দ্রের কারিকুরি ধরেছিল সব॥
সে ঘোড়া ধরা দিয়ে, ধরে আনে—
বাপের বেটা'কে।—
বলো না, সেই পশুটী আসল কিনা
মিলন ঘটাতে।
এ ঘোড়া খায়না কো ঘাস—
বয় বারো মাস,
লোকের বাড়ী বাড়ী—
(আর) দুঃখ নিয়ে ছুটে পালায়—
আনে পয়ের কাঁড়ি।

বেহারী ঘোড়া লইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিল। তাহার গান শুনিয়া
কানাই ও পটলের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। ছেলেদের মুখে হাসি
দেখিয়া শৈলজা ও হরলালের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল।
গীতান্তে বেহারী উচ্চৈস্বরে কহিল।

বেহারী। চল্ ঘোড়া—ছুটে চল্
রোগ বালাই নিয়ে চল্,
আবার আস্‌বি যবে—
পয় আনবি তবে॥
হ্যাট্-হ্যাট্-হ্যাট্-হ্যাট্—

ঘোড়া হাঁকাইবার মত করিয়া বেহারী মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃশ্য হইতে অন্তর্হিত হইল।
কানাই ও পটল সমস্বরে কহিল।

কানাই ও পটল। আবার এসো বেহারী। আবার এসো—

তৃতীয় দৃশ্য

গিরীশের ড্রইং রুম

তখন বৈকাল। হরিশ সবেমাত্র কোর্ট হইতে ফিরিয়া নয়নতারার
সহিত কথা কহিতেছেন।

হরিশ। এত ত কল্লে, কিন্তু বৌঠানের কাছ থেকে চাবিটি ত আজও
আদায় করতে পারলে না।

নয়ন। দেখ না পারি কিনা? সংসারের হিসেব হাতে নিয়েছি। চাবি
হাতে আস্‌তে আর কতক্ষণ?

হরিশ। দেখো, 'সব তোমার আর চাবিকাঠিটি আমার', এই প্রবাদ-বাক্যটি বৌঠান না তোমার ওপর দিয়ে চালান।

নয়ন। হুঁ! চালালেই হোল! মনে রেখো—আমি উকিলের বউ।

হরিশ। তুমিও মনে রেখো—বৌঠানও উকিলের বউ।

নয়ন। সে কথা মানি। কিন্তু দিদির মত আমি একেবারে নীরেট্ নই। পেটে আমার একটু বিদ্যে আছে। ছোট বৌ ঐ বিদ্যেটুকুর জোরেই দিদিকে ঠকিয়ে বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে—

হরিশ। দেখ, তুমি যদি কিছু গোছাতে পার।

নয়ন। আমি ঠিক আছি। এখন তুমি মামলায় জিত্‌লে তবেই বুঝব।

হরিশ। মামলায় জিত্ তো হবেই—

নয়ন। ছোটঠাকুরপো ভাগ বসাতে পারবে না?

হরিশ। এক কাণা কড়িও না। তবে হ্যাঁ, বিদেশ থেকে সময় মত সংসারে এসে না ঢুক্‌লে—রমেশ আমাদের একই পরিবারের লোক হিসেবে একটা ভাগ আদায় করত—সে বিষয় সন্দেহ নেই।

নয়ন। তাই বুঝি চুঁচড়ার জাল গুটিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলে?

হরিশ। এটা আর বুঝতে পারলে না? নইলে অতোদিনের প্র্যাক্‌টিস্‌টা ছেড়ে, তাড়াতাড়ি কি আর কলকাতায় চলে আসি? আর দিনকতক পরে এলে, দাদা নিজেই হয়ত তাকে একটা ভাগ লিখে দিতেন। বিষয়সম্পত্তি যা করেছেন সে তো দাদা নিজে রোজগার করে; তাঁর বিষয় তিনি যাকে খুসী তাকে দিয়ে যেতে পারেন। দেখলাম, রমেশকে তিনি যে রকম ভালবাসেন, তাতে এখানে এসে মাথা না গলালে আর উপায় ছিল না।

নয়ন। সত্যি, তোমার কি মাথা! এমন না হলে উকীল!

হরিশ। তাই পয়লা নম্বর তাকে এখান থেকে তাড়ালাম, দোস্‌রা নম্বর দেশের বাড়ী থেকে তাড়ানোরও চেষ্টা চল্‌ছে—নইলে সেখানে থাকলেও একই পরিবারভুক্ত প্রমাণ করা তার পক্ষে অসুবিধা হবে না। খুড়্‌তুতো ভাই, সে যে মুফাৎসে দাদার বিষয়ে ভাগ বসাবে এ আমি কিছুতেই হতে দেব না—

অদূরে সিদ্ধেশ্বরীকে আসিতে দেখিয়া

নয়ন। চুপ্‌ দিদি আস্‌ছেন (ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে) দিদির যা শরীর হয়েছে কতদিনে যে সেরে উঠবেন তা জানি না। ডাক্তারি ত অনেকদিন হ'লো এবার একজন ভাল কবিরাজকে দেখালে হয় না ?

নয়নতারার কথার মাঝেই সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধে। ডাক্তার বদ্যি দেখিয়ে আর কী হবে মেজবৌ ? জ্বর জালা ত এখন ভাল হয়ে গিয়েছে।

নয়ন। জরটাই না হয় ছেড়েছে, কিন্তু অন্য উপসর্গ ত লেগেই রয়েছে।

হরিশ। সে উপসর্গ ত আর একদিনেই যাবার নয় মেজবৌ ' ভুলতে কিছুদিন সময় লাগ্‌বে ত '

সিদ্ধে। ঠিক বলেছ—মেজ ঠাকুরপো ' এ আমার মনের উপসর্গ! কিছুতেই ওদের ভুলতে পারছি না। যে আঘাত ওরা আমাকে দিয়ে গেছে, যিনি মাথার ওপর দিনরাত্রি করছেন তিনিই তার বিচার করবেন।

হরিশ। তোমার মনে ওরা যে কষ্ট দিয়েছে বৌঠান্‌, আমি যদি তার শোধ তুলতে না পারি, ত আমার নামই নয়। রমেশ এতবড় নেমক্‌-হারাম যে আমাদের খেয়েপরে মানুষ হ'য়ে, শেষে কিনা আমাদেরই নামে মাম্‌লা কর্লে !

সিদ্ধে। বল কি মেজ ঠাকুরপো! ছোট ঠাকুরপো তোমাদের নামে মাম্‌লা করেছে?

হরিশ। হ্যাঁ। দেওয়ানী ত আছেই—উপরন্তু গোটা দুই ফৌজদারীও চল্‌ছে।

সিদ্ধে। (সবিস্ময়ে) বল কি!

হরিশ। হ্যাঁ। দাদাকে ভালমানুষ পেয়ে, ও যা ইচ্ছে তাই আরম্ভ করেছে। তাই মামলা মোকদ্দমা চালানোর ভার আমি নিজের হাতে নিয়েছি।

সিদ্ধে। কিন্তু আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না মেজ ঠাকুরপো! সে এত বেইমানী করতে সাহস করলে কী করে? এখনও যে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে—

নয়ন। সে ত উঠ্‌ছেই, আর ছোট দেওরের তোমরা কী না করেছ? খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ, লেখাপড়া শিখিয়েছ, হাজার হাজার টাকা ব্যবসা কর্‌তে দিয়েছ। ব্যবসা করার নাম করে তখন ত আর ব্যবসা করেনি—টাকাগুলো জমিয়ে রেখেছিলো। এখন সেই টাকার জোরে মামলা লড়্‌ছে—

সিদ্ধে। তা মামলা কেন?

হরিশ। দেখলুম, দেশের বিষয়ই বিষয়। আমাদের অবর্ত্তমানে, আমাদের মণি হরি বিপিন এরা এককাঠা জায়গা-জমি ত পাবেই না, এমন কি দেশের বাড়ীতে পর্য্যন্ত ঢুক্‌তে পাবে না। দেশে যা কিছু আছে—সে সমস্ত সেই ত দখল করে আছে। খাজনাপত্র আদায় কর্চ্ছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে একটা পয়সা দেবার নাম করে না। বিষয় যা কিছু সে ত দাদাই করেছেন অথচ সে আজ দাদার চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দেয় না—এমনি নেমক্‌হারাম। আমারও প্রতিজ্ঞা! ওকে আমি বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব।

সিদ্ধে। তা হ'লে ওরাই বা ছেলেপুলে নিয়ে যাবে কোথায় ?

হরিশ। সে খবরে ত আমাদের দরকার নেই বৌঠান।

সিদ্ধে। তা তোমার দাদা কী বল্লেন ?

হরিশ। দাদা যদি তেমন হতেন, তা'হলে আর ভাবনা কী ছিলো বৌঠান। তাঁকে যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, তাঁর টাকায়, তাঁর খেয়ে পরে মানুষ হয়ে আজ তাঁরই বিষয় নিয়ে গোল-যোগ বাধিয়েছে, তখন তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেও জড়িয়ে ফেল্‌বার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে সেটা আমায় ফাঁসাতে হয়েছে।

নয়ন। আচ্ছা, ছোট ঠাকুরপো না হয় দোষী। কিন্তু আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবৌ—ছোটবৌ এতে মত দিলে কি করে ? আমরা আর সবাই না হয় দুষ্টু বজ্জাত হতে পারি কিন্তু—

নেপথ্যে গিরীশের গলা শোনা গেল—

গিরীশ। হরিশ, হরিশ—

গিরীশের গলা শুনিয়া নয়নতারা ঘোম্‌টা দিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।
গিরীশও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গিরীশ। দেখ, হরিশ, কালকে আমাকে একবার দেশে যেতে হচ্ছে—

হরিশ। দেশে যাবেন ?

গিরীশ। হ্যাঁ, যেতেই হবে। বিনোদ ঠাকুরদা, বারবার করে বলে গেছেন, হাজার হোক আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব—তাঁর মেয়ে নেই, জামাই নেই, ঐ একটি মাত্র নাত্‌নী, তার বিয়ে, না গেলে বড্ড দুঃখ করবেন।

হরিশ। কিন্তু জয়পুরের মক্কেলদের যে কাল আসবার কথা আছে দাদা—

গিরীশ। তা আসবে বলে আর কি করব?

হরিশ। আপনার বোধহয় মনে নেই দাদা, কাল তাদের মাম্‌লার দিন—

গিরীশ। তা আর কি করব? তুমিই না হয় কোনরকমে চালিয়ে নিও—

হরিশ। তা কি হয়? তারা যে—

গিরীশ। অসন্তুষ্ট হবেন? তা আমি একা মানুষ; সকলকে ত আর সন্তুষ্ট করতে পারি না। উকীল হয়ে পর্য্যন্তই ত মিছে কথা বলে আস্‌ছি। আজ না হয় কথা দিয়ে, একটা কথাও রাখি।

সিদ্ধে। ঠিকই ত! কেবল কাজ—কাজ করে বেড়ালেই ত হবে না। লোক-লৌকিকতা এগুলোও ত রাখতে হবে।

গিরীশ। ঠিক্—ঠিক্; (সিদ্ধেশ্বরীর নিকট আগাইয়া গিয়া) তা তুমি আজ কেমন আছো?

সিদ্ধে। তবু ভাল—জিজ্ঞাসা করলে!

গিরীশ। বিলক্ষণ! জিজ্ঞাসা করিনে? এই ত পরশু দিন মণীকে ডেকে বল্লুম—মণি তোর মাকে ঠিকমত ওষুধ-টোষধ দিস্ ত? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েছে এমনি যে বাপ মাকে পর্য্যন্ত মানে না!

সিদ্ধে। দেখ, বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর বলো না! পনের দিন হয়ে গেল—মণি তার পিসীর ওখানে এলাহাবাদে গেছে—আর তুমি তাকে পরশু দিন জিজ্ঞাসা করলে কি করে শুনি?—তা যাক, কিন্তু ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গে যে মামলা হচ্ছে—কই, এ কথা ত তুমি এতদিন আমায় বল নি?

গিরীশ। আরে মামলা ত হবেই। সেটা একটা চোর—চোর! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। বিষয়-আশয় সব নষ্ট করে ফেল্লে!

সেটাকে দূর করে না দিলে আর ভদ্রস্থ নেই। সমস্ত ছারখার করে দিলে—

সিদ্ধে। আচ্ছা তা যেন দিলে। কিন্তু মামলা মোকদ্দমা ত আর শুধু শুধু হয় না টাকা খরচ করা চাই ত! ছোট ঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে?

হরিশ। কেন? মেজবৌ ত তোমায় একটু আগেই বললেন বৌঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে যে হাজার চারেক টাকা নিয়েছিলো—সেটা ত তার হাতে আছে। তাছাড়া ছোট বৌমার হাতেই.ত এতদিন সংসারের টাকাকড়ি সমস্তই ছিল; বুঝেই দেখ না—কোথা থেকে টাকা পাচ্ছে।

গিরীশ উত্তেজিতভাবে বলিলেন।

গিরীশ। আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে! কিছু কী রেখে গেছে? সেটা একটা বেহেদ্দ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। কিছু দিন আগে কোর্টে এসে বলে, বাড়ী ঘরদোর সব মেরামত করতে হবে—পাঁচশ টাকা চাই।

হরিশ। বলেন কী? সাহস তো কম নয়!

গিরীশ। সাহস বলে সাহস! একেবারে লম্বা ফর্দ্দ, এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথ্তে হবে। এটা না বদ্লালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। আরে শুধু কী তাই? তার ওপর বলে কিনা, সংসারের অনটন, শীতের কাপড় চোপড় কিনতে হবে, আলু, ধান কিনে রাখতে হবে। এমনি হাজারও খরচ দেখিয়ে—

হরিশ। নির্লজ্জ—তারপরে?

গিরীশ। নিলজ্জ, বলে নির্লজ্জ, লজ্জা সরম একেবারে নেই! ফর্দ্দটর্দ্দ দেখিয়ে ঠিক আটশ টাকা নিয়ে তবে ছাড়্লো—

হরিশ। নিয়ে গেল! আপনি তাকে আবার টাকা দিলেন?

গিরীশ। না দিয়ে আর উপায় কী ?

হরিশ। তাহলে আর মামলা মোকদ্দমা করে লাভ কী দাদা ?

গিরীশ। না না, কিছু লাভ নেই। নিজের সংসার যে চালিয়ে নেবে, হতভাগার সেটুকুও ক্ষমতা নেই—এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে। শুনলাম বৈঠকখানায় দিব্বি আড্ডা বসিয়ে দিন রাত তাস পাশা চলছে—আর খাচ্ছেন ! ব্যস্ ! মানুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েছে তাই, বুঝলে না হরিশ, আমাদেরও হয়েছে তাই।

কথাগুলি বলিয়া গিরীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

হরিশ। (বিরক্তভাবে) আচ্ছা ! আমি একাই দেখছি। প্রস্থান

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে স্বামীর নিকট আসিয়া কহিলেন।

সিদ্ধে। (কাঁদিয়া) কাল যখন দেশেই যাচ্ছ, তখন ছেলে দুটোকে—

গিরীশ। আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে এখন।

চতুর্থ দৃশ্য

রমেশদের পৈতৃক বাড়ীর একটী ঘর।

ঘরটি সামান্য আসবাব পত্রে সাজানো। সহরের বুকে যে শৈলজার রূপ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, এখানে তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শৈলজা এখন সম্পূর্ণ গ্রাম্য-বধূ। তাহার ঘরেও গ্রাম্যছাপ সুপরিস্ফুট। একটী জলচৌকির ওপর গোপালের মূর্ত্তি। তাহারই সম্মুখে বসিয়া শৈলজাকে ধ্যানস্থ দেখা গেল। শৈলজা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটী তুলিল। দেখা গেল—তাহার দুচক্ষু দিয়া অবিরত জল গড়াইতেছে। অঙ্গে তাহার কোন গহনা নাই। মাত্র এক জোড়া বালা ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া আছে। শৈলজা ব্যথিত চিত্তে কহিল।

শৈল। ঠাকুর আর আমার কিচ্ছু নেই, শেষ সম্বল এই এক জোড়া বালা ! এই নিয়ে এবার যেমন করেই হোক আমায় নিষ্কৃতি দাও।

রমেশ মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। শৈলজা তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। যথারীতি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন

আমার ছেলেরা রোগে ভুগছে, পয়সার অভাবে পত্তি পাচ্ছে না, চিকিৎসা হচ্ছে না। আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কালসার হয়ে গেছেন। এবার আমাকে নিষ্কৃতি দাও ঠাকুর,—নিষ্কৃতি দাও।

রমেশ। শৈল!

শৈলজা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বালা জোড়াটি হাতে লইয়া উঠিল।

শৈল। তুমি কী সদরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছো?

রমেশ। হ্যাঁ! কিন্তু মামলা লড়ার জন্য আজ আর সদরে যাব কিনা ভাব্‌ছি। এক তরফা হয়ে যায় যাক্‌। মামলা মোকদ্দমায় আর কাজ নেই শৈল!

শৈল। সে কি! তুমি মিথ্যের বিরুদ্ধে লড়ছো, তুমি যদি মিথ্যেকে মেনে নাও, তাহলে বুঝবো, সত্যের জন্য লড়াই করার মত তোমার শক্তি নেই বলেই—মিথ্যেকে তুমি মেনে নিচ্ছ।

রমেশ। তা নয় শৈল। এতদিন মেজদার মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করে এসেছি, ছেলের অসুখ, তোমার গয়না, সংসারের অনটন, কোন দিকেই আমি ভ্রূক্ষেপ করিনি। কিন্তু আজ তোমার নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রার্থনা আমার মনকে দমিয়ে দিয়েছে। কাজ নেই শৈল। আমরা বাড়ী ঘর ছেড়ে গাছতলায় থাকব, মোট বয়ে খাবো। তবু জেদ করে আর মামলা লড়ব না।

শৈল। (বালা দু'গাছি রমেশকে দিয়া) এই শেষ সম্বল দিয়ে, শেষ চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। যাত্রা করে যখন বেরিয়েছো—পেছুলে চল্‌বে না—এই নাও।

এক প্রকার জোর করিয়া বালা দু'গাছি রমেশের হাতে দিলেন। ইতিমধ্যে হরলাল ব্যস্তসমস্তভাবে গিরীশকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল।

হর। আসুন, আসুন বড়বাবু, ছোটবাবু এই ঘরে—

গিরীশকে দেখিয়া শৈলজা ঘোম্‌টা টানিয়া দিল। রমেশ সলজ্জে গিরীশের মুখের পানে একবার চাহিল ও পরে প্রণাম করিল।

গিরীশ। বলি, কাগজপত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

রমেশ। জেলায়—

গিরীশ। ও! মামলার দিন আছে বুঝি? (রমেশ নিরুত্তর) কী? কথা কচ্ছিস্ না যে? জবাব দে—হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া, তুমি আমারই খাবে-পরবে, আর আমারই সঙ্গে মামলা লড়বে? তোমাকে একসিকি পয়সারও বিষয় দেব না। দূর হ—আমার বাড়ী থেকে এক্ষুণি দূর হ—এক মিনিটও দেরী নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—

শৈলজা দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

এসো এসো, মা এসো। একি! হাতে কেবল দু'গাছা শাঁখা দেখছি! গয়নাগুলো গেল কোথায়? হতভাগা—বৌমাকে তুমি শাঁখা সার করিয়েছো? বল্—বৌমার গহনা নিয়ে কী করেছিস্? কোথায় রেখেছিস গহনা?

রমেশ কোন জবাব দিল না। তাহার হাতের বালা দু'গাছি দেখিয়া

বৌমার গহনা তোর হাতে কেন? ও বুঝেছি এই সব নিয়ে বুঝি মামলা লড়তে যাচ্ছ? ভাগ্যিস্ বিয়ের ব্যাপারে দেশে এসেছিলাম, তাই তো—নইলে আমার মা লক্ষ্মীকে তো একেবারে পথে বসাতিস্ হতভাগা শূয়োর! সর্ব্বস্ব বেচে উড়িয়ে দিচ্ছিস্?

গহনা কার? আমার। আমি তোমাকে জেলে দিয়ে ছাড়বো তা জানো।

ইতিমধ্যে কানাই ও পটল আসিয়া গিরীশকে জড়াইয়া ধরিল।

আদর করিয়া পটলকে কোলে তুলিয়া লইয়া

ওরে আমার পটল মাণিক!

একবার পটল একবার কানাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন।

হায়, হায়, হায়! ছেলেপুলেগুলো না খেতে পেয়ে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছে। ছেলেপুলেগুলোকে মেরে ফেলে তুমি মামলা চালাচ্ছো? কবে তোর মামলার দিন আছে? বল্—চুপ করে রইলি যে—

রমেশ। (সভয়ে) কাল—

গিরীশ। কাল। তবে আজ যাচ্ছিলি কোথায়? (রমেশ নিরুত্তর) বুঝেছি। তদ্বির করার জন্যে? হুঁ! এখনো সময় আছে—তোর মামলার রায় আমি এক্ষুনি এখানে দিয়ে তবে যাবো। হরলাল—এখুনি একবার বিনোদ ঠাকুরদাকে ডাক? তাঁর সামনে আমি সমস্ত বিষয় বৌমার নামে দানপত্তর করে দিয়ে তবে যাব।

হর। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বড়বাবু। এক্ষুনি যাচ্ছি— ব্যস্তভাবে প্রস্থান

গিরীশ। বৌমা! তুমি সব গোছগাছ করে নাও মা। বিনোদ ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি, আজ রাত্রে লেখাপড়াটা সেরে, কাল সকালে দলীল রেজিষ্ট্রি করে দিয়েই তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবো। হতভাগা যেতে চায়—যাবে, না হয় ওর যা ইচ্ছে তাই করুক, মোটকথা, তোমাদের আর এখানে এভাবে ফেলে রাখতে পারবো না। নাও মা, সব গোছগাছ করে রাখ—

পটল গিরীশের চিবুকে হাত দিয়া কহিল।

পটল। আমিও যাব জেঠু—

গিরীশ। যাবে, যাবে, তোমরা সব্বাই যাবে—নইলে তোমার জেঠিমার শূন্য বিছানা পূর্ণ হবে কি করে? নাও মা! তৈরী হয়ে নাও। একদিন যেমন তোমায় সোনা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে ঘরে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম—তেমনি আজ আবার ভূমি দান করে আশীর্ব্বাদ করে তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। এই যে আমার লক্ষ্মী লাভ মা। লক্ষ্মী লাভ!

পঞ্চম দৃশ্য

গিরীশের কলিকাতার বাড়ী। ড্রইং রুম।

হরিশ উকিলের সাজসজ্জায় হতাশভাবে বসিয়া আছেন। নয়নতারা তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন।

নয়ন। পুরুষমানুষ! অতো মুসড়ে পড়লে কী আর চলে?

হরিশ। হুঁ! আমার এখনো মাথা ঘুরছে, এ অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পাচ্ছি না।

নয়ন। আমি বল্‌ছি এরকম করে মনমরা হয়ে না থেকে, আপীল করো—দেখবে, আপীলে আমরা ঠিক জিত্‌বো। মোকদ্দমায় হার জিত তো আছেই।

সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া নয়নতারা কহিলেন।

দিদি শুনেছো—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে!

সিদ্ধে। কী হলো?

নয়ন। মোকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে!

সিদ্ধে। হার হলো!

নয়ন। এর পরে আমরা সমাজে মুখ দেখাবো কী করে? তোমার

দেওর তো মুস্‌ড়ে পড়েছেন। কত করে বলছি—হাইকোর্টে আপীল করো, হাইকোর্টে হার হয়, আমরা বিলেত পর্য্যন্ত যাবো—এর জন্যে মন-মরা হয়ে থাকলে চলবে কেন ?

সিদ্ধে। আমি বল্‌ছি—মেজঠাকুরপো! তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে—আমি দেবো। তুমি হাইকোর্ট কর, তুমি জিত্‌বেই—আমি আশীর্ব্বাদ করছি।

হরিশ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সে উপায় আর নেই বৌঠান। সব শেষ হয়ে গিয়েছে! হাইকোর্টই বলো আর বিলেতই বলো, কোথাও আর রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই ত দাদার নামে খরিদ ছিল, বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা কর্ত্তে দেশে গিয়ে, তিনি সর্ব্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্তর করে দিয়ে এসেছেন। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর আমাদের উপায় রইল না।

গিরীশ প্রবেশ করিলেন

গিরীশ। এই যে হরিশ, রমেশের ব্যাপার শুনেছো ?

সিদ্ধে। ব্যাপার আর কী শুনবে ? তুমি যা সর্ব্বনাশ করেছো ? তাতে আর—

গিরীশ। হুঁ! সর্ব্বনাশ আবার কী করেছি ?

সিদ্ধে। করনি ? দেশের বিষয়-আশয় কেন তুমি ওদের নামে দানপত্তর করে দিয়ে এলে ?

গিরীশ। কেন দিয়ে এলাম ? দেখ্‌তে চাও ? দেখবে তবে ? ছোট বৌমা! একবার এই দিকে এসো তো মা!

শৈলজা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সিদ্ধে। এ কি শৈল!

গিরীশ। হ্যাঁ। শুধু মানুষটাকে দেখ না। তার কী অবস্থা হয়েছে— তাই ভাল করে দেখ। হতভাগা, বৌমার গহনাগুলো বেচে খেয়েছে। আর একটু হলেই বাড়ীর ইট-কাঠগুলো পর্য্যন্ত বেচে খেতো। আর ছেলেগুলোর কী অবস্থা হয়েছে, তাই তুমি দেখ। ওরে পটল, ওরে কানাই, একবার এদিকে আয়তো বাবা।

কানাই ও পটল জীর্ণশীর্ণ দেহ লইয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী ব্যাকুলভাবে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন।

সিদ্ধে। কে এদের এই অবস্থা করলে?

গিরীশ। কে আবার? সেই হতভাগাটা। তাই সবদিক বিবেচনা করেই তো ভরাডুবি চাটুজ্জ্যে বংশকে মামলার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে এলাম বড়বৌ!

সিদ্ধে। ওগো। তুমি বেশ করেছো। বেশ করেছো। ওগো। তুমি যে সবাইয়ের চাইতে কত বড়, তা আজ যেমন বুঝলাম, তেমন আর কোনদিন বুঝতে পারিনি।

গিরীশ। দেখলে তো বড় বৌ! আমার সব দিকে নজর থাকে কী না? কালকের ছোঁড়া রমেশ, সে কিনা আমার চোখে ধুলো দিয়ে— আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে? তাই আমি এমনি কায়দায় বেঁধে দিয়ে এলাম বড়বৌ! যে সেখানে আর বাছাধনের চালাকীটি চলবে না—চালাকীটি চলবে না—

গিরীশের কথার মাঝে ধীরে ধীরে যবনিকা নামিতে থাকে।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬